আরো টুনটুনি ও আরো ছোটাচ্চু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

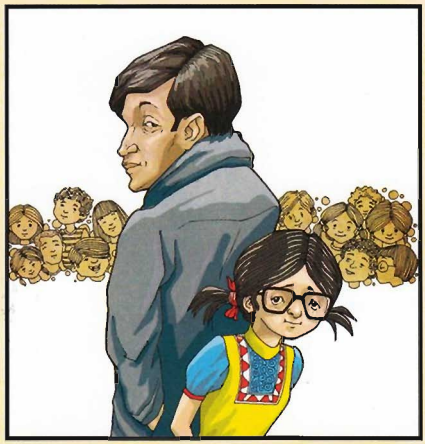

ঘরের মাঝামাঝি কয়েকটা চেয়ার বসানো হয়েছে, তার একটাতে ফারিহা বসে আছে। টুনি ছোটাচ্চুর হাত ধরে তাকে টেনে এনে ফারিহাপুর কাছে আরেকটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ঘরের বাচ্চা-কাচ্চারা সবাই চোখের কোনা দিয়ে ছোটাচ্চু আর ফারিহাকে লক্ষ করছে কিন্তু আগে থেকে বলে দেয়া আছে কেউ যেন তাদের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে থাকে, তাই সবাই বিয়ের হৈ-হুল্লোড়ে ব্যস্ত আছে, এরকম ভান করতে লাগল।

ফারিহাপুর কাছে চেয়ারে বসে ছোটাচ্চু গম্ভীর মুখে ফারিহাকে বলল, "কেমন আছ?"

ফারিহাপু বলল, "ভালো।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

তারপর দুইজন আর বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না। দুইজনই মুখ শক্ত করে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল, তাদের দেখে মনে হতে থাকে তারা একজন আরেকজনকে চেনে না।

টুনি চোখের কোনা দিয়ে দুইজনকে লক্ষ করে তারপর দরজার দিকে তাকায়। সেখানে গুড্ডু দাঁড়িয়ে আছে। টুনি তাকে একটা সিগন্যাল দিল, তখন গুড্ডু ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকে চিৎকার করে বলল, "বরযাত্রী এসে গেছে। বরযাত্রী এসে গেছে।"

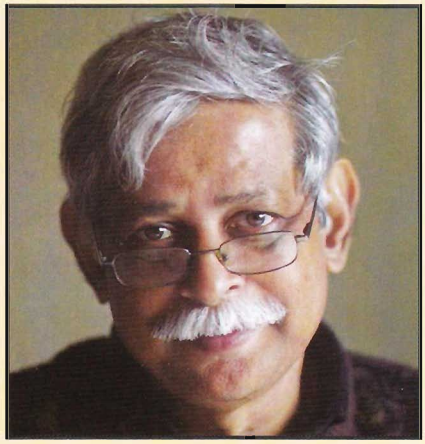

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

প্রচ্ছদ :: সাদাতউদ্দীন আহমেদ এমিল

আরো টুনটুনি
ও
আরো ছোটাচ্চু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

আমেরিকা
হিমঘরে ঘুম ও অন্যান্য
সবুজ ভেলভেট
কাচ সমুদ্র
নিশিকন্যা
রাতুলের রাত রাতুলের দিন
আমি তপু
বৃষ্টির ঠিকানা
মেয়েটির নাম নারীনা
বেজি
ভূতের বাচ্চা কটকটি
রতন
বুগাবুগা
সাগরের যত খেলনা
ঘাস ফড়িং
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি
ডজন উজন পশুপাখি
টুনটুনি ও ছোটাচ্চু

আরো টুনটুনি ও আরো ছোটাচ্চু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পার্ল পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব
প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সাদাতউদ্দীন আহ্‌মেদ এমিল

ISBN : 978-984-495-151-8

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী
কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : সৃজনী, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩০০.০০

Aaro Tuntuni O Aaro Chotacchu by Muhammed Zafar Iqbal
Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : January 2015, Price : 300 Tk. Only
e-mail : pearl_publications@yahoo.com

উৎসর্গ

কয়েক বছর আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলের ছাত্রীরা কারাটে শিখতে শুরু করেছিল। আমি তখন বলেছিলাম তাদের ভেতর যে প্রথম ব্ল্যাক বেল্ট হতে পারবে তাকে আমি একটা বই উৎসর্গ করব। (বই উৎসর্গ করানোর দ্বিতীয় আরো একটা পদ্ধতি ছিল কিন্তু সেটা প্রকাশ্যে বলা যাবে না!) আমার ঘোষণার কারণেই কি না জানি না, একজন নয় দুইজন নয়-নয় নয়জন ছাত্রী একসাথে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে।

কাজেই আমি আমার কথা রেখে এই বইটি এই নয়জন ব্ল্যাক বেল্টধারী ছাত্রীদের উৎসর্গ করছি। তারা হচ্ছে :

ঝুমুর দেব, ফারহানা ফেরদৌস শিউলী, আমিনা সুলতানা, জয়তি দত্ত, লাকী বেগম, শারমিন সুলতানা কণা, উম্মে মরিয়ম মৌসুমী, সাবিহা তাসনিম জেসি, সাথী রানী শর্মা

টুনটুনি ও ছোটাচ্চু ধারাবাহিকভাবে কিশোর আলোতে প্রকাশিত হচ্ছিল, লেখা শেষ হবার পর সেটি এই নামে একটা বই হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে। আমি লেখা শেষ করলেও কিশোর আলোর পাঠকেরা সেটা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হয়নি, বলা যায় তাদের প্রবল চাপের কারণে আমাকে আবার লিখতে শুরু করতে হয়েছিল–সকল চাপকে উপেক্ষা করা যায়, ভালোবাসার চাপ উপেক্ষা করা কঠিন।

আরো টুনটুনি ও আরো ছোটাচ্চু নাম দিয়ে এই বইটি প্রকাশ করার সময় বইয়ের শেষে নতুন একটি অংশ লিখে সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে–যেটুকু লিখেছিলাম সেটা পড়ে কেমন জানি অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছিল!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১ আগস্ট, ২০১৪

টুনিদের স্কুলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ম্যাডামের নাম মারদানা ম্যাডাম। মহিলাদের গোঁফ থাকার কথা না কিন্তু টুনিদের স্কুলে বলাবলি করা হয় যে মারদানা ম্যাডামের গোঁফ আছে। কথাটা শুনে অনেকেই ভুরু কুঁচকাতে পারে, একজন মানুষের গোঁফ আছে কি নেই সেটা নিয়ে বলাবলি করার কী আছে? তার মুখের দিকে তাকালেই তো সেটা দেখা যাবে। কিন্তু আসলে তার মুখের দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায় না, তার কারণ মারদানা ম্যাডামের গায়ের রং কুচকুচে কালো এবং তার গোঁফ যদি আসলেই থেকে থাকে সেটার রংও কুচকুচে কালো, তাই সেটা আলাদা করে দেখা যায় না। খুব কাছে গেলে অবশ্যই সেটা দেখা যাবে, কিন্তু কার ঘাড়ে দুইটা মাথা আছে যে মারদানা ম্যাডামের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করবে তার গোঁফ আছে কি নেই! যে সমস্ত ছেলেমেয়েদেরকে মারদানা ম্যাডাম কাঁচা চিবিয়ে খেয়েছেন (ঠিক আক্ষরিক অর্থে না, ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়ার অর্থে) তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে মারদানা ম্যাডামের নাকের নিচে ঝাঁটার মতো কালো গোঁফ। তারা আরো বলেছে যে তার চোখের মাঝে মোটা হয়ে থাকা লাল লাল রক্তনালি—সেগুলো নাকি দপদপ করে কাঁপে এবং তার মুখে নাকি মাংসাশি প্রাণীর মতো গন্ধ। যাই হোক এর সবগুলো পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব না, কাজেই কেউ কখনো এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার চেষ্টা করেনি। টুনিদের ক্লাশ মনিটর বলেছে মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন নাকি সবার আগে গোঁফ পাকতে শুরু করে, কাজেই যদি সত্যি সত্যি মারদানা ম্যাডামের গোঁফ থেকে থাকে তাহলে আর কয়েক বছরের ভেতর সেগুলো পেকে সাদা হয়ে যাবে, তখন তার কুচকুচে কালো রঙের মাঝে সাদা গোঁফ খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। তখন সব বিতর্ক বন্ধ হয়ে যাবে।

এই যে ভয়ঙ্কর মারদানা ম্যাডাম তার থেকেও ভয়ঙ্কর স্যার হচ্ছে মতিউর স্যার। এই স্যার নিয়েও স্কুলে নানা রকম গুজব চালু আছে। যে গুজবটা সবচেয়ে বেশি চালু সেটা হচ্ছে উনিশ শ' একাত্তর সালে মতিউর স্যার রাজাকার কমান্ডার ছিল, দেশ স্বাধীন হলে গ্রামের মানুষেরা ধরে তার কান কেটে দিয়েছে। মতিউর স্যারের ডান কানটা নাকি রাবারের তৈরি, প্রত্যেক দিন সকালে স্কুলে আসার সময় সুপার গ্লু দিয়ে কানটা নাকি লাগিয়ে নেয়। বিষয়টা পরীক্ষা করা খুব সোজা, ডান কানটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলেই সেটা নিশ্চয়ই খুলে আসবে কিন্তু সেটা কে করবে? তবে শোনা যায় পাস করে বের হয়ে গেছে এরকম একজন ছাত্রী নাকি কিরা কেটে বলেছে যে মতিউর স্যার একবার খুব জোরে হাঁচি দিয়েছিল তখন তার ডান কানটা খুলে এসেছিল—সে সেটা নিজের চোখে দেখেছিল। সত্যি সত্যি কথাটা কে বলেছে সেটা অবশ্যি কখনোই প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। মতিউর স্যারের অনেকগুলো বেত আছে, একটা শিলং থেকে আনা হয়েছে, একটা বান্দরবানের, আরেকটা নেত্রকোনার। সরকার থেকে বেত মারা নিষেধ করে দেওয়ার পর মতিউর স্যারের মনের দুঃখে প্রায় হার্ট এটাকের মতো অবস্থা হয়েছিল। মতিউর স্যার এখনো মাঝে মাঝে ক্লাশে বেতগুলো নিয়ে আসে, বাতাসে শপাং শপাং করে মারে আর ছাত্রছাত্রীদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যেহেতু বেত মারতে পারে না তাই গালিগালাজ করে মনের ঝাল মেটায়। তার গালির মতো বিষাক্ত গালি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। যাকে একবার স্যার গালি দেয় কমপক্ষে এক মাস তার মন-মেজাজ খারাপ থাকে।

এই যে ভয়ঙ্কর মতিউর স্যার তার থেকেও ভয়ঙ্কর হচ্ছে নার্গিস ম্যাডাম! কথাটা শুনে সবাই মনে করতে পারে নার্গিস ম্যাডাম বুঝি দেখতে মারদানা ম্যাডাম আর মতিউর স্যার থেকেও ভয়ঙ্কর। কিন্তু আসলে সেটা সত্যি নয়, নার্গিস ম্যাডাম দেখতে অসাধারণ। দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হয় সিনেমার নায়িকা, শুকনো পাতলা ছিপছিপে, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, চুলগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রাখা, সেখানে বেলী ফুলের মালা, পরনে আকাশী-নীল তাঁতের শাড়ি। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় ইন্ডিয়ান বাংলা সিরিয়ালের নায়িকা কথা বলছে। কিন্তু যারা তাকে চিনে তারা সবাই জানে নার্গিস ম্যাডাম হচ্ছে ভয়ঙ্কর থেকেও ভয়ঙ্কর।

শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে নার্গিস ম্যাডাম যে কোনো ছাত্র কিংবা ছাত্রীর শরীরের সব রক্ত শুষে নিতে পারেন। একবার নাকি ক্লাশ নাইনের একজন ছাত্রীর দিকে নার্গিস ম্যাডাম তিরিশ সেকেন্ড কোনো কথা না বলে তাকিয়ে ছিলেন, সেই ছাত্রী বাসাতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ল। হাসপাতালে গিয়ে তাকে দুই ব্যাগ এ পজিটিভ রক্ত দিতে হয়েছিল!

নার্গিস ম্যাডাম যখন ক্লাশে আসেন তখন ক্লাশের ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে ভয়ে নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে যায়। শোনা যায়, নার্গিস ম্যাডাম যদি নিচু ক্লাশের কোনো ছেলের কিংবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এই ছেলে' কিংবা 'এই মেয়ে' তাহলে নাকি তাদের কাপড়ে বাথরুম হয়ে যায়।

সেই ভয়ঙ্কর নার্গিস ম্যাডাম একদিন টুনিদের ক্লাশে এসে টুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই মেয়ে!"

টুনি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। নার্গিস ম্যাডামের দিকে সরাসরি তাকানোর সাহস কারো নেই, তাই টুনি তার নাকের দিকে তাকিয়ে বলল, "জি ম্যাডাম।"

সমস্ত ক্লাশ তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। নার্গিস ম্যাডাম বললেন, "সেই দিন টেলিভিশনে দেখলাম একজন বড় সন্ত্রাসীকে ধরেছে বলে পুলিশ একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভকে পুরস্কার দিচ্ছে।"

টুনি ঢোঁক গিলে বলল, "জি ম্যাডাম।" গাবড়া বাবা সেজে থাকা গাল কাটা বকইর‍্যাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে পুলিশ থেকে ছোটাচ্চুকে একটা চেক দিয়েছিল, কয়েকটা টেলিভিশন চ্যানেলে সেটা দেখানো হয়েছিল, নার্গিস ম্যাডাম মনে হয় সেই অনুষ্ঠানটা দেখেছিলেন।

নার্গিস ম্যাডাম বললেন, "তোমাকে দেখলাম সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের পাশে সাজুগুজু করে দাঁড়িয়ে ছিলে।" সাজুগুজু শব্দটা উচ্চারণ করার সময় একটা টিটকারির ভান করলেন আর সেটা শুনে সারা ক্লাশ শিউরে উঠল। টুনি ফ্যাকাসে মুখে বলল, "জি ম্যাডাম।"

নার্গিস ম্যাডাম তার ভ্রমরের মতো কালো চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন জানতে পারি?"

টুনি বলল, "প্রাইভেট ডিটেকটিভ হচ্ছেন আমার ছোট চাচা।"

"সেই জন্যে তুমি টেলিভিশন ক্যামেরায় নিজের চেহারা দেখানোর জন্যে সাজুগুজু করে তোমার ছোট চাচার লেজ ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

সারা ক্লাশ আবার শিউরে উঠল। টুনি ভাবল একবার বলে, আসলে সে মোটেই সাজুগুজু করে ছোটাচ্চুর লেজ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল না। পুলিশের লোকেরা কীভাবে জানি খবর পেয়েছিল যে টুনি গাবড়া বাবার চুল আর দাড়ি টেনে খুলে ফেলে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাই তারাই ছোটাচ্চুর পাশে তাকে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নার্গিস ম্যাডামের মুখের উপর সেই কথা বলা সম্ভব না, তাই সে কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নার্গিস ম্যাডাম তার ফুলের মতো ঠোঁটগুলো সাপের মতো বাঁকা করে বললেন, "শোনো মেয়ে, টেলিভিশনে চেহারা দেখানোর জন্যে অ-জায়গায় কু-জায়গায় নিজের মাথা ঢুকিয়ে দেবে না। যদি কোনোদিন নিজের যোগ্যতায় টেলিভিশনে তোমার চেহারা দেখাতে পারো তাহলে ক্যামেরার সামনে যাবে। না হলে যাবে না। বুঝেছ?"

টুনি মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে।

নার্গিস ম্যাডাম তখন পুরো ক্লাশকে লক্ষ করে বললেন, "তোমাদেরকেও বলে রাখি। একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তার আত্মসম্মানবোধ। তোমরা কোনোদিন শুধুমাত্র টেলিভিশনের ক্যামেরায় নিজের চেহারা দেখানোর জন্যে এই আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিবে না। যার আত্মসম্মানবোধ নাই তার কিছু নাই।" 'কিছু নাই' কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যে মনে হলো ক্লাশ রুমের ভেতর দিয়ে মেশিনগানের গুলি ছুটে গেল। সারা ক্লাশ আতঙ্কে শিউরে উঠল।

ক্লাশ শেষে নার্গিস ম্যাডাম চলে যাবার পর সবাই টুনির কাছে ছুটে এলো, সবাই জিজ্ঞেস করল সে ঠিক আছে কি না। একজন বলল, "বাসায় গিয়ে লবণ পানি খাবি। তারপর শুয়ে থাকবি।" আরেকজন বলল, "গরম পানি দিয়ে গোসল করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বি।"

দুষ্টু টাইপের একজন বলল, "টেলিভিশনের ক্যামেরায় আমিও ঢুকে যাই। বই মেলায় গিয়ে আমি সব সময় ক্যামেরাম্যানদের পিছনে পিছনে হাঁটি। যখনই দেখি কারো ইন্টারভিউ নিচ্ছে তখনই পিছনে দাঁড়িয়ে যাই। একদিন আমাকে তিনটা চ্যানেলে দেখিয়েছিল!"

টুনি কিছু বলল না। সবাই ধরেই নিয়েছে টেলিভিশনে চেহারা দেখানোর জন্যে সে বুঝি জোর করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। কী লজ্জা! টুনির একবার মনে হলো সত্য কথাটা বলে দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না।

ক্লাশের ছেলেমেয়েরা চলে যাবার পর টুনির কাছে এলো তাদের ফার্স্ট গার্ল মৌটুসী। মৌটুসী লেখাপড়ায় খুব ভালো, তার চেহারাও খুব ভালো, সে খুব ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, নজরুলগীতির কম্পিটিশনে সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, মৌটুসী কারাতে ক্লাশে ভর্তি হয়ে রেড বেল্ট পর্যন্ত গিয়েছে, স্কুলের স্পোর্টসে সে লংজাম্পে ফার্স্ট হয়েছে, গণিত আর পদার্থ বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে সে মেডেল পেয়েছে। স্কুলের শেষে সে নাচের ক্লাশে যায় নাচ শিখতে, সে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে, গল্প লেখার কম্পিটিশনে সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর কম্পিটিশনের লোকেরা যে বই লিখেছে সেই বইয়ে তার গল্প ছাপা হয়েছে। এক কথায় একজন মেয়ের যা যা ভালো থাকার কথা মৌটুসীর তার সবকিছু আছে, কিন্তু তার একটা অনেক বড় সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে সে এক সেকেন্ডের জন্যেও ভুলতে পারে না যে সে রূপে-গুণে সবার থেকে ভালো! সে কারণে অহঙ্কারে তার মাটিতে পা পড়ে না আর তাই ক্লাশের কেউ তাকে দুই চোখে দেখতে পারে না। মৌটুসীর তাই ক্লাশে কোনো বন্ধু নেই, সে একা একা ঘুরে বেড়ায়।

আজকেও সে একা একা টুনির কাছে এলো। এসে বলল, "আমি যখন নজরুলগীতি কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম তখন আমাকে টেলিভিশনে দেখিয়েছিল।"

টুনি মাথা নাড়ল, কোনো কথা বলল না। মৌটুসী তখন বলল, "যখন আমার গল্পটা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তখন পত্রিকায় আমার ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছিল।"

টুনি এবারেও মাথা নাড়ল, কোনো কথা বলল না। মৌটুসী বলল, "আমি যখন অলিম্পিয়াডে মেডেল পাই তখন আমাদের গ্রুপ ফটো তোলে, সেই গ্রুপ ফটো সব পত্রিকায় ছাপা হয়।"

টুনি আবার মাথা নাড়ল, এবারেও কোনো কথা বলল না। তখন মৌটুসী মনে হয় একটু রেগে গেল, রেগে গিয়ে বলল, "আমি তোমার

মতো টেলিভিশনে নিজের চেহারা দেখাতে মামা-চাচাদের পিছনে ঘুরি না। টেলিভিশনের ক্যামেরা আমার কাছে আসে। বুঝেছ?"

টুনি সাধারণত রাগে না কিন্তু এবারে একটু রেগে গেল, কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। মৌটুসীর দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসার ভঙ্গি করল।

মৌটুসী রেগে গিয়ে বলল, "তুমি আমার দিকে তাকিয়ে এভাবে হাসছ কেন?"

টুনি বলল, "তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার আনন্দ হয়, তাই আমি হাসি!"

মৌটুসী থতমত খেয়ে বলল, "আমাকে দেখলে আনন্দ হয়?"

টুনি মাথা নাড়ল। মৌটুসী জিজ্ঞেস করল, "কেন আনন্দ হয়?"

টুনি বলল, "তোমার চেহারা এত সুন্দর, তোমার এত গুণ সেই জন্যে।"

মৌটুসী এবারে হকচকিয়ে গেল, টুনি সত্যি বলছে না টিটকারি করছে সেটা সে বুঝতে পারল না, তাই হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

টুনি একা একা চুপচাপ বসে থাকে, তার মনটা খুব খারাপ। সে ছোটাচ্চুর আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে জোর করে ঢুকে গিয়ে অনেক কিছু করেছে কথাটা সত্যি, কিন্তু সেগুলো সে করেছে তার করতে ভালো লাগে বলে। টেলিভিশনে তার চেহারা দেখাবে সেটা কখনো তার মাথাতেই আসেনি। এখন সবাই ভাবছে টেলিভিশনে চেহারা দেখানোর জন্য সে হ্যাংলার মতো ছোট চাচার পিছনে পিছনে তার লেজ ধরে ঘুরছে। কী লজ্জা! কী অপমান! কী দুঃখ! টুনির চোখে একেবারে পানি চলে আসছিল কিন্তু সে জোর করে চোখ থেকে পানি বের হতে দিল না। মুখটা শক্ত করে বসে রইল।

বাসাতে এসেও তার মনটা খারাপ হয়ে থাকল, সে এমনিতেই কথা কম বলে, সব সময় চুপচাপ থাকে, তাই বাসার কেউ সেটা টের পেল না। পরের দিন তার স্কুলে যেতেই ইচ্ছে করছিল না, যদি স্কুলে না যায়, সবাই কিন্তু একটা সন্দেহ করে বসে থাকবে, তাই সে স্কুলে গেল। স্কুলে এসেও সে তার নিজের সিটে চুপচাপ বসে রইল।

আজকেও নার্গিস ম্যাডামের ক্লাশ আছে, আজকে ক্লাশে এসে নার্গিস ম্যাডাম কিছু একটা বলে ফেলবেন কি না সেটা নিয়েও তার ভেতরে একটা অশান্তি।

কিন্তু হঠাৎ করে সবকিছু অন্য রকম হয়ে গেল। ক্লাশ শুরু হওয়ার ঠিক আগে আগে ক্লাশের সবচেয়ে যে দুষ্টু ছেলে সে খুবই উত্তেজিতভাবে ক্লাশে ঢুকে বেঞ্চে নিজের বইয়ের ব্যাগটা রেখেই ছুটে টুনির কাছে এসে হাজির হলো। তার হাতে একটা পত্রিকা, পত্রিকাটা খুলে সে টুনিকে দেখিয়ে বলল, "টুনি! এই দ্যাখ!"

টুনি দেখল পত্রিকায় তার বিরাট একটা ছবি, চোখে চশমা, মুখে চাপা হাসি, হাতে কয়েকটা বই ধরে রেখেছে। ছবির নিচে বড় বড় করে লেখা 'ক্ষুদে গোয়েন্দা'। তার নিচে একটু বড় বড় করে লেখা, 'কেমন করে ধরা হলো গাবড়া বাবা ওরফে গাল কাটা বকইর‍্যাকে।' তার নিচে ছোট ছোট করে অনেক কিছু লেখা। যখন সবাই মিলে গাবড়া বাবাকে ধরে ফেলেছিল তখন মনে আছে একজন মানুষ অনেকক্ষণ টুনির সাথে কথা বলেছিল, তার অনেকগুলো ছবিও তুলেছিল। সেই মানুষটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক, সেই নিশ্চয় খবরটা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছে। টুনির খুব ইচ্ছে করছিল পত্রিকায় কী লিখেছে পড়ে দেখে কিন্তু সবার সামনে সেটা করতে তার একটু লজ্জা লাগল। তাই সে পত্রিকাটা এক নজর দেখে চুপচাপ বসে রইল।

সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটা বলল, "টুনি! তুই কোনোদিন আমাদেরকে বলিসনি তুই এত বড় ডিটেকটিভ!"

টুনি বলল, "আমি মোটেই বড় ডিটেকটিভ না।"

দুষ্টু ছেলেটা চিৎকার করে বলল, "বড় ডিটেকটিভ না হলে পত্রিকায় কোনোদিন এত বড় করে ছবি ছাপা হয়? মন্ত্রীদের ছবিও এত বড় করে ছাপা হয় না।"

দুষ্টু ছেলেটার চিৎকার শুনে অন্যেরাও তখন চলে এলো, তারাও পত্রিকার ছবিটা আর নিচের ক্যাপশানটা পড়ে চিৎকার করতে লাগল। আর সেই চিৎকার শুনে অন্যেরা এসে পত্রিকাটা দেখে আরো জোরে চিৎকার করতে লাগল, পত্রিকাটা ধরে কাড়াকাড়ি করতে লাগল। সবাই মিলে টুনিকে ঘিরে লাফাতে লাগল, পত্রিকায় কী লিখেছে সেটা একজন

আরেকজনকে ধাক্কাধাক্কি করে, জোরে জোরে পড়তে লাগল। সবাই এলেও মৌটুসী এলো না, সে দূরে তার সিটে বসে রইল, টুনিকে ঘিরে যে এত হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচি সেটা নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখাল না। টুনির বুঝতে বাকি রইল না যে হিংসায় মৌটুসীর বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। সে যখন কোনো মেডেল পায় তখন সে ক্লাশে এসে সেটা সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করে, কেউ কোনোদিন সেটা ভালো করে দেখারও চেষ্টা করে না। কিন্তু আজ টুনিকে নিয়ে সবার কত আনন্দ, কত উত্তেজনা—তার হিংসা তো হতেই পারে।

ঠিক তখন ক্লাশের ঘণ্টা পড়ে গেল বলে টুনিকে ঘিরে উত্তেজনাটা আপাতত থেমে যেতে হলো।

নার্গিস ম্যাডাম যখন ক্লাশে ঢুকলেন তখন অন্যান্য প্রত্যেক দিনের মতো ক্লাশ একেবারে কবরের মতো নীরব হয়ে গেল। দেখে বোঝারও উপায় নেই ক্লাশে কোনো জীবিত মানুষ আছে, মনে হয় সবাই বুঝি নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে।

নার্গিস ম্যাডাম পড়াতে শুরু করলেন। ম্যাডাম বাংলা কবিতা পড়ান, এত সুন্দর কবিতা কিন্তু ছেলেমেয়েদের সেই কবিতা উপভোগ করার কোনো সুযোগ নেই, তারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে কখন কিছু একটা ভুল হয়ে যায় আর চোখের দৃষ্টি দিয়ে ম্যাডাম তাদের রক্ত শুষে নেন।

নার্গিস ম্যাডাম কবিতাটা পড়ে শোনাতে শোনাতে হঠাৎ একটা কাগজের খচমচ শব্দ শুনে তাকালেন এবং দেখতে পেলেন তৃতীয় বেঞ্চের মাঝামাঝি একটা ছাত্র একটা খবরের কাগজ খুব সাবধানে পিছনের বেঞ্চে পাচার করার চেষ্টা করছে। খবরের কাগজটিতে টুনির ছবি ছাপা হয়েছে এবং যে এখনো দেখেনি তার আর অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না বলে নার্গিস ম্যাডামের ক্লাশেই এই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের কাজটি করে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

নার্গিস ম্যাডাম বললেন, "এই ছেলে তুমি কী করছ?"

নার্গিস ম্যাডাম মোটেও গলা উঁচিয়ে বলেননি, কিন্তু তবুও মনে হলো ক্লাশে বুঝি একটা বজ্রপাত হয়েছে। যে দুজন অপরাধী তাদেরকে নার্গিস ম্যাডাম দাঁড়াতে বলেননি কিন্তু দুজনই কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে

গেল এবং দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। তাদের দুই পাশে যারা বসেছিল তারা যে কোনো মুহূর্তে বাথরুম হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা করে দুই পাশে একটু সরে গেল।

নার্গিস ম্যাডাম খুবই শান্ত গলায় বললেন, "তোমাদের হাতে ওটা কী?"

একজন দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করল, "খ-খ-খ-" কিন্তু সে পুরো খবরের কাগজ বলে শেষ করতে পারল না। নার্গিস ম্যাডাম বরফের মতো শীতল আর চায়নিজ কুড়ালের মতো ধারালো চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং দুইজনকে দেখে মনে হলো তারা বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে শুরু করেছে।

নার্গিস ম্যাডাম বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "কী আছে খবরের কাগজে? কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর যে ক্লাশে বসেই পড়তে হবে?"

ছেলে দুটির একজন মাথা নেড়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। অন্যজন বলল, "টু-টু-টু" কিন্তু সেও কথা শেষ করতে পারল না। ক্লাশের সবাই বুঝে গেল সে টুনির নাম বলার চেষ্টা করছে। টেলিভিশনে টুনিকে দেখেই নার্গিস ম্যাডাম খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, খবরের কাগজে তার ছবি দেখে ম্যাডাম কী করবেন সেটা চিন্তা করে সবাই শিউরে উঠতে লাগল। কেউ লক্ষ করল না বলে দেখতে পেল না শুধুমাত্র মৌটুসীর মুখে একটা আনন্দের ছায়া পড়ল।

নার্গিস ম্যাডাম হাত বাড়িয়ে বললেন, "খবরের কাগজটা দেখি।"

তৃতীয় বেঞ্চের ছেলেটা খবরের কাগজটা দ্বিতীয় বেঞ্চের ছেলেকে দিল, দ্বিতীয় বেঞ্চের ছেলেটা দিল প্রথম বেঞ্চের একজন মেয়েকে, সে সেটা দিল নার্গিস ম্যাডামকে। নার্গিস ম্যাডাম কাগজটা হাতে নিয়ে খুললেন, সাথে সাথে তার চোখ পড়ল টুনির বড় ছবিটাতে। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, মাথাটা একটু কাত করলেন (ভয়ে সারা ক্লাশের সবাই নিজেদের অজান্তে মাথা কাত করে ফেলল) তারপর পুরোটা পড়লেন। পড়ে মাথাটা সোজা করলেন। (সারা ক্লাশ মাথা সোজা করল) তারপর খবরের কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখলেন।

AMARBOI.COM

ক্লাশের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল, সবার বুক ভয়ে-আতঙ্কে ধুকপুক করছে। যে দু'জন ছেলে দাঁড়িয়েছিল তারা তাদের হাঁটুতে আর জোর পাচ্ছে না, মনে হতে থাকে যে কোনো মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে।

নার্গিস ম্যাডাম ডাকলেন, "টুনি।"

টুনি উঠে দাঁড়াল।

নার্গিস ম্যাডাম বললেন, "আমি গতকালকে বলেছিলাম তোমার চাচার লেজ ধরে তোমার টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে যাওয়া উচিত হয়নি। মনে আছে?"

টুনি শুকনো গলায় বলল, "মনে আছে ম্যাডাম।"

"এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি তোমার চাচার লেজ ধরে ক্যামেরার সামনে যাওনি, তুমি নিজের যোগ্যতাতেই গিয়েছ।"

টুনি একটু হকচকিয়ে গিয়ে নার্গিস ম্যাডামের দিকে তাকাল। আলোচনাটা কোন দিকে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। এখন কি সে আগের থেকেও বড় অপরাধ করে ফেলেছে? কাজেই টুনি কিছু না বলে নার্গিস ম্যাডামের নাকের দিকে তাকিয়ে রইল।

নার্গিস ম্যাডাম শীতল গলায় বললেন, "এই পত্রিকার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমার চাচাই তোমার লেজ ধরে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে গিয়েছেন। কথাটা কি ঠিক?"

টুনি গলাটা পরিষ্কার করে বলল, "আসলে আমরা কেউ টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে যাই নাই। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট একটা অনুষ্ঠান করেছিল, সেখানে গিয়েছিলাম। অনেক সাংবাদিক ছিল। তার মাঝে টেলিভিশন ক্যামেরা ছিল।"

ক্লাশের ছেলেমেয়েরা হতবাক হয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না যে, টুনি সরাসরি নার্গিস ম্যাডামের সাথে কথা বলছে। টুনিকে তখন তাদের মনে হতে থাকে বিশাল সাহসী একটা বাঘের বাচ্চা! কিংবা কে জানে বাচ্চা নয়—আস্ত বাঘ!

"তুমি গতকাল আমাকে বিষয়টা বলো নাই কেন?" নার্গিস ম্যাডামের গলায় কিছু একটা ছিল যেটা শুনে সারা ক্লাশ কেমন যেন শিউরে উঠল।

টুনি কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করল। নার্গিস ম্যাডাম তার গলাটা আরেকটু উঁচু করে এবারে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন বলো নাই?"

ক্লাশের বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ে আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল। টুনি একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "ভয়ে।"

নার্গিস ম্যাডামকে দেখে মনে হলো কথাটা শুনে খুব অবাক হয়েছেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "কীসের ভয়ে?"

টুনি বলল, "আপনার ভয়ে।"

নার্গিস ম্যাডাম অবাক হয়ে বললেন, "আমার ভয়ে?"

টুনি কোনো কথা না বলে এবারে নার্গিস ম্যাডামের স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে রইল। নার্গিস ম্যাডাম বললেন, "আমাকে তুমি ভয় পাও?"

টুনি মুখটা একটু ওপরে তুলে বলল, "সবাই ভয় পায়।"

"সবাই ভয় পায়?" নার্গিস ম্যাডাম অবাক হয়ে ক্লাশের দিকে তাকালেন, তাকে দেখে মনে হতে লাগল তিনি আশা করছেন সবাই এখন হা হা করে হেসে উঠবে তারপর মাথা নেড়ে বলবে, "না না আমরা ভয় পাই না! কেন ভয় পাব?"

কিন্তু কেউ সেটা বলল না। সবাই তার সামনের ছেলে কিংবা মেয়ের পিছনে মাথা লুকিয়ে ফেলল। একেবারে সামনের বেঞ্চে যারা আছে তাদের লুকানোর কেউ নাই, তাই তারা যতটুকু সম্ভব মাথা নিচু করে নিজের হাতের নখ কিংবা ডেস্কের উপর রাখা বাংলা বইটার দিকে তাকিয়ে রইল।

নার্গিস ম্যাডাম কেমন যেন হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর টুনির দিকে তাকালেন, বললেন, "কী আশ্চর্য! কেন ভয় পায়?"

টুনি নার্গিস ম্যাডামের চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে তার গলার লকেটের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না। ম্যাডাম বললেন, "টুনি। তুমি ডিটেকটিভ, তুমিই বলো, কেন আমাকে সবাই ভয় পায়?"

টুনি ঢোঁক গিলে বলল, "বলব?"

"বলো।"

টুনি আরেকবার ঢোঁক গিলে বলল, "ভয় করছে ম্যাডাম।"

"ভয়ের কিছু নাই। বলো।"

টুনি মনে মনে একবার দোয়া ইউনুস পড়ে বুকে ফুঁ দিল তারপর বলল, "আপনাকে সবাই ভয় পায় কারণ আপনি কোনোদিন হাসেন না।"

সারা ক্লাশের মনে হলো যে তাদের উপর দিয়ে একটা টর্নেডো উড়ে গেল, সবার মনে হলো তারা সেই টর্নেডোতে উড়ে যাবে, সবকিছু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না, নার্গিস ম্যাডাম কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "আমি হাসি না!"

নার্গিস ম্যাডাম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, সরাসরি তাকানোর সাহস নেই বলে সবাই চোখের কোনা দিয়ে নার্গিস ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা অবাক হয়ে দেখল নার্গিস ম্যাডামের ঠোঁটের কোনায় একটা সূক্ষ্ম হাসি উঁকি দিচ্ছে। মনে হলো ম্যাডাম হাসিটা চেপে রাখার চেষ্টা করছেন কিন্তু চেপে রাখতে পারছেন না, ধীরে ধীরে তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর সপ্তম আশ্চর্যের থেকেও বড় আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। নার্গিস ম্যাডাম হঠাৎ ফিক করে একটু হেসে ফেললেন।

AMARBOI.COM

সারা ক্লাশ তখন একসাথে ফিক করে হেসে উঠল। ম্যাডাম তখন আরেকটু হাসলেন, ক্লাশের সবাই তখন আরেকটু হাসল। তারপর নার্গিস ম্যাডাম হাসতেই লাগলেন আর ক্লাশের সবাই হাসতে লাগল। টুনি শুধু অবাক হয়ে নার্গিস ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রইল, ম্যাডাম যখন হাসেন তখন হঠাৎ করে তার সেই ভয়ঙ্কর চেহারাটা আর থাকে না, দেখে মনে হয় একেবারে স্বাভাবিক মানুষ।

নার্গিস ম্যাডাম তার হাসি থামালেন, ছেলে-মেয়েরা সাথে সাথে হাসি থামাল না, তারা আরো কিছুক্ষণ হাসল। ম্যাডাম তখন টেবিল থেকে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন, "তোমরা সবাই টুনির উপর লেখাটা পড়েছ?"

যে ব্যাপারটা আগে কখনো ছেলেমেয়েরা কল্পনা করেনি সেটাই তারা করে ফেলল। কেউ কেউ চিৎকার করে বলল, "পড়েছি!" অন্যেরা আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "পড়ি নাই!"

"ঠিক আছে, সবাই যেহেতু পড়ো নাই আমি তাহলে পড়ে শোনাই।" তারপর ম্যাডাম নিজে খবরের কাগজের লেখাটা পড়ে শোনালেন। ছেলে-মেয়েরা শুনল, মাঝে মাঝে হাততালি দিল, টেবিলে থাবা দিল, এমনকি কয়েকবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল। দশ মিনিট আগে তারা সেটা করতে পারবে কল্পনা পর্যন্ত করেনি।

শুধু মৌটুসী পাথরের মতো মুখ করে বসে রইল।

এর পরে স্কুলে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে গেল। প্রথমে ক্লাশের ছেলে-মেয়েরা তারপর স্কুলের ছেলে-মেয়েরা ডিটেকটিভ টুনির কাছে তাদের সমস্যা নিয়ে আসতে শুরু করল। বিচিত্র তাদের সমস্যা! যেমন একজন এসে বলল :

"আমার গল্প বই পড়তে ভালো লাগে, আমার আব্বু-আম্মু আমাকে গল্প বই পড়তে দেয় না। কী করব?"

টুনি সমাধান দিল, "পাঠ্য বইয়ের নিচে গল্প বই রেখে পড়ে ফেলো।"

আরেকজন এসে বলল, "রাত্রে ঘুমাতে ভয় লাগে।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কীসের ভয়?"

"ভূতের।"

টুনি একটা কাগজে লিখল : ৬ ১ ৮
৭ ৫ ৩
২ ৯ ৪

তারপর সেটা তাকে দিয়ে বলল, "এই কাগজটা ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে ঘুমাবে।"

"এটা কী?"

"ম্যাজিক স্কয়ার। ভূত একটা জিনিসকে খুব ভয় পায়। সেটা হচ্ছে অংক। আর অংকের মাঝে সবচেয়ে বেশি ভয় ১৫ সংখ্যাটাকে। এই কাগজে যে সংখ্যা লেখা আছে সেটা যেভাবেই যোগ করবে ১৫ হবে। ভূত এটাকে খুব ভয় পায়। বালিশের নিচে রাখলে ভূতের বাবাও আসবে না!"

আরেকজন এসে বলল, "লেখাপড়া ভালো লাগে না।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"স্যার কী বলে বুঝি না।"

AMARBOI.COM

"কেন?"

"স্যার বোর্ডে কী লেখে সেইটাও দেখি না।"

টুনি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের চশমাটা খুলে তাকে দিয়ে বলল, "এটা পরে দেখো তো কেমন লাগে।"

চশমা পরে সে অবাক হয়ে বলল, "আরে! সবকিছু স্পষ্ট— একেবারে ঝকঝক করছে।"

টুনি বলল, "তোমার চোখ খারাপ হয়েছে। আব্বু-আম্মুকে বলে চোখের ডাক্তারের কাছে গিয়ে চশমা নাও।"

আরেকজন এসে বলল, "সানজিদা আমার খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে 'পাগল'।"

টুনি বলল, "তুমি তার খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখ 'ছাগল'।"

ছাত্রছাত্রীরা শুধু নিজের সমস্যা নিয়ে আসতে লাগল তা না। নিজেদের বাসার বিভিন্ন মানুষের সমস্যা নিয়েও আসা শুরু করল। একজন এসে বলল, "ভাইয়া জানি কীরকম হয়ে গেছে। সারাক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়, আর নিজেকে দেখে।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "চুলে জেল দেয়?"

"হ্যাঁ।"

"শরীরে পারফিউম?"

"হ্যাঁ।"

"বয়স কত? ষোল-সতেরো?"

"হ্যাঁ।"

টুনি বলল, "নরমাল। হরমোন কিক করেছে।"

যে সমস্যাটা নিয়ে এসেছে সে বলল, "তার মানে কী?"

"তার মানে এই বয়সের ছেলেরা মেয়েদের সামনে নিজেদের সুন্দর দেখানোর জন্যে সাজুগুজু করে।"

"কেন?"

"তুমি এখন বুঝবে না। তোমার বয়স যখন ষোল-সতেরো হবে তখন বুঝবে।"

"তোমার বয়স কি ষোল-সতেরো হয়েছে?"

"না।"

"তাহলে তুমি কেমন করে বুঝ?"

AMARBOI.COM

টুনি ইতস্তত করে বলল, "আমি তো ডিটেকটিভ—আমার বুঝতে হয়।"

আরেকজন এসে বলল, "আব্বু হঠাৎ মোচ কেটে ফেলেছে। এখন আব্বুকে চেনা যায় না, দেখে মেয়ে মানুষের মতো লাগে।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "বয়স কত? চল্লিশের কাছাকাছি?"

"হ্যাঁ?"

"নরমাল। তোমার আব্বুর মোচ পাকতে শুরু করেছে। প্রথমে একটা-দুইটা টেনে তুলে ফেলেছে, এখন আর কুলাতে পারছে না, তাই পুরোটা কামিয়ে ফেলেছে।"

শুধু যে বাসার সমস্যা নিয়ে এলো তা-ই না, এক-দুইজন তাদের মেডিক্যাল সমস্যাও নিয়ে এলো। বেশিরভাগ সমস্যা অবশ্যি কাউকে বলার মতো না। একটা-দুইটা হয়তো একটু চিন্তা-ভাবনা করে বলা যেতে পারে। যেমন একটা ছেলে অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বলল। "আমি যখন হিসু করি তখন রং হয় হলুদ, ফান্টার মতো।"

টুনি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "বেশি করে পানি খাও তাহলে রং হবে সেভেনআপের মতো। আর যদি না খাও—"

ছেলেটা শুকনো মুখে বলল, "যদি না খাই?"

"তাহলে আস্তে আস্তে তোমার হিসুর রং হয়ে যাবে কোকের মতো।"

ছেলেটা ফ্যাকাশে মুখে তখনই ছুটে বের হয়ে গেল, একটু পরেই দেখা গেল সে ঢকঢক করে পানি খাচ্ছে।

তবে টুনির কাছে সবচেয়ে চমকপ্রদ সমস্যাটা নিয়ে এলো মৌটুসী। একদিন যখন আশেপাশে কেউ নেই তখন মৌটুসী তার কাছে এসে বলল, "টুনি তুমি তো ডিটেকটিভ।"

টুনির ক্লাশের ছেলে-মেয়েরা সবাই সবাইকে তুই করে বলে, মৌটুসী ছাড়া। তার সাথে কারো ভাব নেই তাই সে সবাইকে তুমি তুমি করে বলে। টুনি মৌটুসীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ডিটেকটিভ এখনো হই নাই। হওয়ার চেষ্টা করছি।"

মৌটুসী বলল, "দেখি তুমি কত বড় ডিটেকটিভ।" তারপর সে ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে টুনিকে দিয়ে বলল, "এই চিঠিটা কে লিখেছে বের করে দাও।"

AMARBOI.COM

টুনি কাগজটা খুলে দেখে পুরো চিঠিটা উল্টো করে লেখা। টুনি বলল, "যে লিখেছে সে তোমার পরিচিত। তাই এভাবে লিখেছে, যেন হাতের লেখা চিনতে না পারো।"

মৌটুসী বলল, "এটা কীভাবে পড়তে হবে জানো? একটা আয়নার সামনে ধরলে—"

টুনি বলল, "আয়না লাগবে না।" তারপর কাগজটা জানালার আলোর দিকে উল্টো করে ধরল, মোটামুটি বেশ স্পষ্টভাবে লেখাটা সোজা হয়ে দেখা গেল। চিঠিতে লেখা :

মৌটুসী

আমি তোমাকে খুব হিংসা করি। আমরা কেউ কিছু পারি না কিন্তু তুমি গান গাইতে পারো, ছবি আঁকতে পারো, নাচতে পারো। শুধু তাই না, তুমি লেখাপড়াতেও এত ভালো। সবচেয়ে বড় কথা তুমি দেখতে এত সুন্দর। খোদা কেন সবকিছু একজনকে দিল, আমাদের কেন কিছু দিল না?

ইতি

একজন হিংসুক

AMARBOI.COM

টুনি চিঠিটা মৌটুসীকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এই চিঠিটা তোমাকে কে লিখেছে বের করার কোনো দরকার নেই।"

"কেন?"

"এইটা সিরিয়াস কিছু না। কেউ ঠাট্টা করেছে।"

"ঠাট্টা?" মৌটুসী মনে হয় বেশ অবাক হলো। "ঠাট্টা কেন হবে?"

"ঠাট্টা না হলে এগুলো লিখে না। যদি চিঠিতে তোমাকে গালাগালি করত, ভয় দেখাত তাহলে সেটা বের করতে মজা হতো। এটা খুবই পানসে চিঠি।"

"তোমার কী মনে হয় এটা কি ক্লাশের কোনো ছেলে লিখেছে?"

"নাহ্। ছেলে লেখে নাই।"

"তুমি কীভাবে জানো?"

"আমাদের ক্লাশের কোনো ছেলেরই এখনো হরমোন কিক করে নাই। কোনো মেয়ে দেখতে সুন্দর কি না সেটা তারা জানে পর্যন্ত না!

তাদের কাছে ছেলে-মেয়ে সুন্দর-ভ্যাবলা সব এক। এখন তারা ক্রিকেট খেলা ছাড়া আর কিছু বুঝে না।"

"তবুও তুমি কি বলতে পারবে এটা কে লিখেছে?"

"পারব।"

"কে?"

টুনি বলল, "সেটা তোমার জানার কোনো দরকার নাই।" তারপর সে মৌটুসীর দিকে তাকিয়ে হাসার ভঙ্গি করল, যার অর্থ গোপন চিঠি নিয়ে আলোচনা শেষ। তাই একটু পরে মৌটুসী মন খারাপ করে চলে গেল।

পরের দিন সকালবেলাতেই মৌটুসী আবার টুনির কাছে হাজির হলো, তার হাতে আরেকটা কাগজ। টুনিকে বলল, "এই যে আরেকটা চিঠি পেয়েছি, বলতে পারবে এটা কে লিখেছে?"

"টুনি বলল, দেখি।"

মৌটুসী বলল, "এই চিঠিতে অনেক গালিগালাজ।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। এই দেখো।"

টুনি চিঠিটা হাতে নিল, এইটাও উল্টো করে লেখা, টুনি কাগজটা উল্টো করে আলোতে ধরে রেখে পড়ল,

মৌটুসী

সাবধান! তোমার কারণে ক্লাশে আমাদের কত কষ্ট। স্যার-ম্যাডামের বকাবকি শুনতে হয়। তাদের গালাগালি শুনতে হয়। তুমি এখনি সাবধান হয়ে যাও তা না হলে তোমার উপরে অনেক বিপদ। আমি তোমাকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিব। তুমি কী তাই চাও?

তোমার আজরাইল

টুনি চিঠিটা মৌটুসীকে ফেরত দিল। মৌটুসী বলল, "কে লিখেছে বলতে পারবে?"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তার আগে বলো, চিঠিটা পেলে কেমন করে? খামে করে বাসার ঠিকানায় পাঠিয়েছে?"

"না।"

AMARBOI.COM

"তাহলে?"

"আমার ব্যাগের ভিতরে ছিল।"

"ও!" টুনি বলল, "তাহলে এইটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নাই। ক্লাশের কেউ তোমার সাথে মজা করছে।"

মৌটুসী বলল, "কিন্তু আমি জানতে চাই। তুমি না এত বড় ডিটেকটিভ, পত্রিকায় তোমার ছবি ছাপা হয়, আর এইটা বের করতে পারবে না?"

"পারব।"

"তাহলে বের করো।"

"আমার এই চিঠির একটা কপি দরকার।"

"ফটোকপি?"

"না ফটোকপি লাগবে না। আমি চিঠিটা পড়ি তুমি একটা কাগজে লিখে দাও।"

টুনি তখন চিঠিটা পড়ল আর মৌটুসী সেটা কাগজে লিখে দিল। মৌটুসীর লেখা চিঠিটা হাতে নিয়ে টুনি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো?"

মৌটুসী মুখ শক্ত করে বলল, "সেটা আমি কেন তোমাকে বলব?"

"একজন ডিটেকটিভ যখন কেস সলভ করতে যায় তখন তাকে সবকিছু বলতে হয়।"

"আমি যদি বলে দেই তাহলে তুমি কীসের ডিটেকটিভ?"

"তুমি যদি জানো তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"আমি দেখতে চাই তুমি কত বড় ডিটেকটিভ।"

তাদের কথা শুনে ক্লাশের একটা ছেলে এগিয়ে এলো, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

টুনি বলল, "কিছু না।"

মৌটুসী বলল, "টুনি কত বড় একজন ডিটেকটিভ সেইটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম।"

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

"আমার কাছে কে যেন চিঠি লিখছে। টুনিকে বলছিলাম বের করতে কিন্তু টুনি সেটা বের করতে পারছে না।"

"কী চিঠি লিখছে?"

AMARBOI.COM

মৌটুসী বেশ উৎসাহ নিয়ে চিঠিটা বের করে ছেলেটাকে দিল। ছেলেটা চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, "এ তো দেখি উল্টা লেখা!"

টুনি বলল, "কাগজটা উল্টো করে জানালার সামনে ধরো। তাহলে পড়তে পারবে।"

ছেলেটা জানালার সামনে ধরে চিঠিটা পড়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "কী ভয়ঙ্কর!"

কাজেই কিছুক্ষণের মাঝেই ক্লাশের সবাই জেনে গেল মৌটুসীর কাছে কে যেন গোপনে ভয়ঙ্কর চিঠি পাঠাচ্ছে! সবাই মৌটুসীর কাছে সেই ভয়ঙ্কর চিঠি দেখতে আসা শুরু করল। মৌটুসী মনে হয় ব্যাপারটা বেশ পছন্দই করল। যখনই কেউ আসছে তাকেই সে খুব উৎসাহ নিয়ে চিঠিটা দেখাতে লাগল। মৌটুসী সব সময়েই সবার কাছ থেকে গুরুত্ব পেতে চায়।

পরের দিন মৌটুসী আরেকটা চিঠি নিয়ে এলো, এই চিঠিটা আগের থেকেও লম্বা, আগের থেকেও বড়। এই চিঠিটাও কোনো একজন তার ব্যাগের ভিতরে রেখে দিয়েছে। চিঠিটা আরো ভয়ঙ্কর। এই চিঠিটাতে শুধু যে মৌটুসীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা নয়, শাস্তিটা কী হতে পারে সেটার বর্ণনা দেওয়া গেছে। (চুলের মাঝে চিউয়িংগাম লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাগের ভেতর বিষ পিঁপড়া রেখে দেওয়া, শরীরের মাঝে মাকড়সা ফেলে দেওয়া, বাসার ভিতরে সাপ ছেড়ে দেওয়া) এরকম ভয়ঙ্কর চিঠি পেয়েও মৌটুসী খুব ঘাবড়ে গেল না! চিঠিটা টুনির হাতে দিয়ে বলল, "এই যে আরেকটা চিঠি!"

টুনি চিঠিটার মাঝে চোখ বুলিয়ে মৌটুসীকে ফিরিয়ে দিল। মৌটুসী জিজ্ঞেস করল, "পড়বে না?"

"নাহ্। পড়ার দরকার নাই।"

"কেন?"

"কী লিখতে পারে আমি জানি।"

"তাহলে বলো, কে লিখছে এই চিঠিগুলো।"

টুনি চুপ করে রইল। মৌটুসী ঠোঁট উল্টে বলল, "যদি বলতে না পারো তাহলে স্বীকার করে নাও তুমি বের করতে পারবে না।"

টুনি এবারেও কথা বলল না। মৌটুসী তখন বলল, "তুমি কচু ডিটেকটিভ।"

টুনি কোনো কথা না বলে মৌটুসীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

মৌটুসী বলল, "কী হলো তুমি হাসছ কেন বোকার মতো?"

টুনি বলল, "তার আগে বলো তুমি কেন প্রত্যেক দিন নিজের কাছে একটা করে চিঠি লিখো? তোমার কোনো কাজ নাই?"

মৌটুসীর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, তোতলাতে তোতলাতে বলল, "আ-আ-আমি?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। তোমার প্রথম চিঠিটা পড়েই আমি বুঝেছিলাম, এরকম চিঠি তুমি নিজে ছাড়া আর কেউ লিখবে না।"

মৌটুসী গলা উঁচিয়ে বলল, "না—আমি লিখি নাই।"

টুনি গলা নামিয়ে বলল, "মনে আছে আমি তোমাকে দিয়ে তোমার চিঠি কপি করিয়েছিলাম? কেন করেছিলাম জানো?"

"কেন?"

"দেখার জন্যে গোপন চিঠি আর তোমার চিঠির বানান ভুল একরকম হয় কি না!"

মৌটুসী মুখ শক্ত করে বলল, "আমার কোনো বানান ভুল হয় না।"

"গোপন চিঠিতেও কোনো বানান ভুল হয় না। একটা ছাড়া—"

"কোনটা?"

"কী। ক দীর্ঘ ঈকার আর ক হ্রস্ব ইকার-এর পার্থক্যটা তুমি শিখো নাই, গোপন চিঠি যে লিখেছে সেও, শিখে নাই। লিখেছে তুমি 'কী' তাই চাও? লেখার কথা ছিল তুমি 'কি' তাই চাও?"

মৌটুসীর মুখটা লাল হয়ে উঠল, "পার্থক্যটা কী?"

"নার্গিস ম্যাডামকে জিজ্ঞেস কোরো।"

মৌটুসী বলল, "তোমার সব কথা ভুল।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি কিছু জানো না।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি কচু ডিটেকটিভ।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে। শুধু একটা জিনিস।"

"কী জিনিস?"

"গোপন চিঠিগুলো তুমি কীভাবে পেতে?"

"আমার ব্যাগে।"

"তোমার ব্যাগে আমিও প্রত্যেক দিন একটা করে চিঠি দিয়েছি। আমার চিঠিগুলো তুমি পাও নাই, কেন জানো? তার কারণ তুমি কোনোদিন তোমার ব্যাগে কোনো চিঠি খুঁজে দেখো নাই! তুমি চিঠিগুলো নিজে বসে বসে লিখেছ, কেন ব্যাগে চিঠি খুঁজবে?"

মৌটুসী কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল, বলল, "তুমি কী লিখেছ চিঠিতে?"

"বাসায় গিয়ে পড়ে দেখো। তোমাকে বলেছি নিজেকে চিঠি লেখা বন্ধ করতে।"

ঠিক এরকম সময় কয়েকজন ছেলেমেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। একজন মৌটুসীকে জিজ্ঞেস করল, "মৌটুসী, আজকে কোনো চিঠি এসেছে?"

মৌটুসী কিছু বলার আগে টুনি বলল, "না। আসে নাই।"

"আসে নাই?"

"না। আর আসবে না।"

"আসবে না? কেন আসবে না?"

"তার কারণ যে গোপনে চিঠি লিখত সে ধরা পড়ে গেছে।"

সবাই চিৎকার করে বলল, "কে? কে চিঠি লিখত?"

"আমাদের ক্লাশের?"

"ছেলে না মেয়ে?"

"নাম কী?"

টুনি বলল, "আমি তাকে বলেছি সে যদি আর গোপন চিঠি না লিখে তাহলে তার নাম আমি কাউকে বলব না। সে রাজি হয়েছে।"

"প্লিজ প্লিজ আমাদের বলো, আমরা কাউকে বলব না।"

টুনি বলল, "আমি মৌটুসীকে নামটা বলেছি, তোমরা মৌটুসীকে জিজ্ঞেস করো। সে যদি বলে আমার কোনো আপত্তি নাই।"

তারপর টুনি হেঁটে চলে গেল আর সবাই তখন মৌটুসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা ভেবেছিল মৌটুসী গোপন পত্র লেখকের নাম বলবে।

কিন্তু দেখা গেল মৌটুসীরও নাম বলতে আপত্তি আছে! সে মুখ শক্ত করে বসে রইল।

এরপর থেকে মৌটুসীর কাছে আর কোনোদিন কোনো গোপন চিঠি আসেনি।

AMARBOI.COM

টুনি ছোটাচ্চুর ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে ছোটাচ্চুর উত্তেজিত গলার স্বর শুনে দাঁড়িয়ে গেল। ছোটাচ্চু বলছে, "না না না, এটা কিছুতেই সম্ভব না।"

সাধারণ কথাবার্তা না শুনলে ক্ষতি নেই কিন্তু কেউ যখন উত্তেজিত গলায় কথা বলে তখন সেটা শুনতে হয় আর কথাটা যদি ছোটাচ্চু বলে তাহলে কথাটা অবশ্যই ভালো করে শোনা দরকার। টুনি তাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল, শুনল ছোটাচ্চু বলছে, "দেখেন, আমাদের আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি তৈরি হয়েছে মানুষের সমস্যা মেটানোর জন্যে। এটা মোটেও ভূতের সমস্যার জন্যে তৈরি হয় নাই। আমরা ভৌতিক সমস্যা মেটাতে পারব না।"

বোঝাই যাচ্ছে ছোটাচ্চু টেলিফোনে কথা বলছে, অন্য পাশ থেকে কী বলছে টুনি সেটা শুনতে পেল না, যেটাই বলুক সেটা শুনে ছোটাচ্চু মোটেও নরম হলো না, আরো গরম হয়ে বলল, "আপনার মোটেও ডিটেকটিভ এজেন্সির সাহায্যের দরকার নাই। আপনার দরকার পীর-ফকির না হলে সাধু-সন্ন্যাসী। তাদের কারো কাছ থেকে একটা হাই পাওয়ার তাবিজ নিয়ে নেন। দেখবেন সমস্যা মিটে যাবে।"

ছোটাচ্চু আবার চুপচাপ কিছু একটা শুনল, শুনে আরেকটু গরম হয়ে বলল, "আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি এক কথার মানুষ, আমি আপনাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমাদের এজেন্সি কখনো ভূত-প্রেত, জিন-পরী নিয়ে কাজ করে নাই, ভবিষ্যতেও করবে না। লাখ টাকা দিলেও না। আপনি শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করছেন।"

টুনি বুঝতে পারল কথা শেষ করে ছোটাচ্চু টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিল। টুনি কিছুক্ষণ দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল

তারপর কিছু জানে না শুনে না এরকম ভান করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। ছোটাচ্চু টুনিকে দেখে নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করে বলল, "যত সব পাগল-ছাগল।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কে পাগল-ছাগল?"

ছোটাচ্চু হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "এই তো!" তার মানে ছোটাচ্চু টুনিকে ভূত পার্টির কথা বলতে চাইছে না, টুনি তাই ভান করল সে কিছুই শুনে নাই। একটু এদিক-সেদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নতুন কোনো কেস এসেছে ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, "নাহ্।"

টুনি শেষবার চেষ্টা করল, "কেউ কখনো ফোন-টোন করে না?"

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে টুনির দিকে তাকাল, তারপর বলল, "করে আবার করে না।"

এই কথাটার অর্থ যা কিছু হতে পারে। টুনি বুঝতে পারল ছোটাচ্চু ভূত পার্টির কথা নিজে থেকে বলবে না, অন্য কোনো লাইনে চেষ্টা করতে হবে। টুনি খুব চাইছিল ছোটাচ্চু এই ভূত পার্টির কেস নিয়ে নিক কিন্তু কীভাবে সেটা করবে বুঝতে পারল না। সে খানিকক্ষণ চিন্তা করল তারপর বুঝতে পারল ফারিহাপুর লাইন ছাড়া গতি নেই। তাই তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ছোটাচ্চু, তোমার মোবাইল ফোনটা একটু দেবে?"

ছোটাচ্চু চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

মোবাইল ফোন দিয়ে কেউ কান চুলকায় না কিংবা চুল আঁচড়ায় না, মোবাইল ফোন দিয়ে মানুষ টেলিফোন করে, কাজেই ছোটাচ্চুর এই প্রশ্নটার কোনো অর্থ নেই, এর উত্তর দেওয়ারও দরকার নেই। কিন্তু গরজটা যেহেতু টুনির তাই সে ধৈর্য ধরে উত্তর দিল, "একটা জরুরি ফোন করতে হবে।"

ছোটাচ্চু মুখের মাঝে একটা বিরক্তির ভান করে ফোনটা টুনির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নে। বেশিক্ষণ লাগাবি না কিন্তু, আমার কিছু জরুরি ফোন আসবে।"

টুনি মাথা নেড়ে ফোনটা হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। ছোটাচ্চু যেন শুনতে না পায় সেরকম দূরে গিয়ে ফোনটা টেপাটেপি শুরু করে

AMARBOI.COM

ফারিহার নাম্বারটা বের করে ডায়াল করল। ডায়াল টোন একটা দেশাত্মবোধক গান, বেশ সুন্দর, গানটা যখন উপভোগ করতে শুরু করেছে তখন ফারিহার গলার স্বর শুনতে পেল। খানিকটা ধমকের সুরে বলল, "কী সাহেব? আমাকে কী মনে করে?"

টুনি বলল, "ফারিহাপু আমি টুনি।"

"ও টুনি! আমি ভাবলাম শাহরিয়ার—তা কী খবর?

"ফারিহাপু, তোমাকে একটা কাজে ফোন করেছি।"

"কী কাজ?"

"কাজটা একটু গোপনীয়। আমি যে তোমাকে ফোন করছি ছোটাচ্চু সেটা জানে না।"

ফারিহা শব্দ করে হাসল, বলল, "জানার দরকার নেই। কী কাজ বলো?"

টুনি বলল, "ছোটাচ্চুর একটা কেস এসেছে। ছোটাচ্চু কেসটা নিতে চাচ্ছে না।"

"কী বললে? শাহরিয়ারের কেস এসেছে সে কেস নিতে চাচ্ছে না?"

"না। ফারিহাপু, তুমি কি ছোটাচ্চুকে কেসটা নিতে রাজি করাতে পারবে?"

"কিন্তু আগে শুনি কেন রাজি হতে চাচ্ছে না। সে তো দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা কেসের জন্যে বসে থাকে। এখন পেয়েও নিচ্ছে না, ব্যাপার কী?"

টুনি বলল, "আমি ঠিক জানি না, ছোটাচ্চুর কথা শুনে মনে হলো কেসটা ভূতের, আর ছোটাচ্চু ভূতকে খুব ভয় পায়।"

"শাহরিয়ার ভূতকে ভয় পায়?"

"হ্যাঁ। ভূত আর মাকড়সা।"

ফারিহা বলল, "মাকড়সাকে ভয় পাওয়া না হয় বুঝতে পারলাম কিন্তু ভূতকে ভয় পায় মানে কী? সে কোনখানে ভূত দেখেছে?"

টুনি ফারিহার কথা শুনে আরো উৎসাহ পেল, বলল, "আমিও তো তাই বলি! যেটা কেউ কখনো দেখে নাই সেটাতে ভয় পাওয়ার কী আছে! দেখা পেলে আরো ভালো, ধরে নিয়ে আসা যাবে।"

AMARBOI.COM

ফারিহা থতমত খেয়ে বলল, "ধরে নিয়ে আসা যাবে?"

"হ্যাঁ। বড় হলে খাঁচায় ভরে, মাঝারি সাইজ হলে বোতলে ভরে আর ছোট হলে শিশিতে ভরে—"

ফারিহা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, একটা ভূতকে যে বোতল কিংবা শিশিতে ভরে আনা যায় সেটা সে কখনো চিন্তা করেনি। টুনি বলল, "ফারিহাপু, তুমি প্লিজ ছোটাচ্চুকে কেসটা নিতে একটু রাজি করাবে? প্লিজ প্লিজ? আমার খুব ভূত দেখার শখ।"

ফারিহা বলল, "কিন্তু আমি তো ভূতের ক্লায়েন্ট সম্পর্কে কিছুই জানি না। শাহরিয়ারকে কী বলব? কীভাবে বলব?"

টুনি বলল, "সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমি যে তোমাকে বলেছি সেটা কিছুতেই বলতে পারবে না। সেটা বললে ছোটাচ্চু আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

ফারিহা কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, "যদি এই ভূতের ক্লায়েন্ট কারা সেটা জানতে পারতাম তাহলে চেষ্টা করে দেখা যেত—"

টুনি বলল, "এক সেকেন্ড! ছোটাচ্চুর এই ফোনে তার টেলিফোন নম্বর আছে। এই মাত্র ফোন করেছিল।"

"বের করে বলো দেখি।"

টুনি ভূতের পার্টির টেলিফোন নম্বরটা বের করে ফারিহাকে জানিয়ে দিল।

ছোটাচ্চুকে ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে টুনি তাড়াতাড়ি চলে যাবার চেষ্টা করছিল, ছোটাচ্চু তাকে থামাল। জিজ্ঞেস করল, "এতক্ষণ কার সাথে গুজগুজ-ফুসফুস করছিলি?"

টুনি বলল, "এই তো!"

"এই তো মানে?"

টুনি কোনো উত্তর না দিয়ে উদাস মুখে দাঁড়িয়ে রইল, একটু আগে ছোটাচ্চু নিজেও বলেছে 'এই তো!' তখন টুনি জানতে চায়নি 'এই তো' মানে কী? এখন ছোটাচ্চু কেন জানতে চাইছে? ডিটেকটিভ হবার পর মনে হয় ছোটাচ্চুর কৌতূহল বেড়েছে, মোবাইল টিপে দেখে নিল টুনি কাকে ফোন করেছে, ফারিহার নাম দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই ফারিহাকে ফোন করেছিস?"

AMARBOI.COM

টুনি মাথা নাড়ল।

"কেন?"

"এই তো!"

ছোটাচ্চু রেগে গেল, বলল, "এই তো এই তো করবি না, মাথা ভেঙে দেব। কেন ফোন করেছিলি?"

টুনি খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগল বিশ্বাসযোগ্য কী বলা যায়। তারপর বলল, "একটা শব্দের ইংরেজি জানার জন্যে।"

ছোটাচ্চু মুখ হাঁ করে বলল, "শব্দের ইংরেজি?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে জিজ্ঞেস করলি না কেন?"

"তুমি বাংলাই ভালো করে জানো না ইংরেজি কতটুকু জানবে?"

ছোটাচ্চু থমথমে গলায় বলল, "আমি বাংলা জানি না?"

"নাহ্। মনে নাই হেসেছে না বলে তুমি বলো হাসি করেছে! আমরা বলি অমুক গেছে, তমুক যাবে আর তুমি বল অমুক গেছে তমুক গাবে।

ছোটাচ্চু মেঘস্বরে বলল, "আমি কখন এইটা বলি?"

টুনি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘাড় বাঁকাল, দাদুর কাছে সবাই শুনেছে ছোটাচ্চু ছেলেবেলায় এভাবে কথা বলত, সেই বিষয়টাকে এভাবে বেশি দূর টানাটানি করা বুদ্ধির কাজ হবে না। টুনি আবার ঘর থেকে বের হবার চেষ্টা করল, ছোটাচ্চু তখন হুংকার দিয়ে তাকে থামাল, "তুই কোন শব্দের ইংরেজি জানার জন্যে আমাকে জিজ্ঞেস না করে ফারিহাকে ফোন করেছিস?"

টুনি শুকনো মুখে ঢোঁক গিলে বলল, "শব্দটা হচ্ছে—শব্দটা হচ্ছে—ইয়ে—" হঠাৎ করে টুনির ঠিক শব্দটা মনে পড়ে গেল, সে বলল, "শব্দটা হচ্ছে অভিমান।"

"অভিমান?" ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে বলল, "অভিমানের ইংরেজি জানিস না? অভিমানের ইংরেজি হচ্ছে—ইয়ে মানে—" ছোটাচ্চু মাথা চুলকাতে থাকে, টুনি সেই ফাঁকে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিকালবেলা ফারিহা এসে হাজির আর তাকে দেখে ছোটাচ্চুর মুখ একশ' ওয়াট বাতির মতো জ্বলে উঠল। সবগুলো দাঁত বের করে বিশাল একটা হাসি দিয়ে বলল, "আরে ফারিহা তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি কি তোমাদের বাসায় আসতে পারি না?"

"অবশ্যই আসতে পারো।"

ফারিহা বলল, "বিশেষ করে যখন তোমার জন্যে বিশাল একটা কাজ করে ফেলেছি তখন তো আসতেই পারি।"

ছোটাচ্চুর মুখ আনন্দে দুইশ' ওয়াট বাতির মতো জ্বলে উঠল, বলল, "আমার জন্যে কী কাজ করেছ?"

ফারিহা চোখ বড় বড় করে বলল, "তোমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির জন্যে একটা বিশাল ক্লায়েন্ট জোগাড় করেছি।"

"সত্যি?" ছোটাচ্চুর মুখ এবার তিনশ' ওয়াট বাতির মতো জ্বলতে লাগল।

"হ্যাঁ। এক ভদ্রলোকের গাজীপুরের দিকে একটা বাগানবাড়ি আছে সেই বাড়িতে রাতে কেউ থাকতে পারে না। ভূতের নাকি উপদ্রব।" ফারিহা শরীর দুলিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল।

ছোটাচ্চুর তিনশ' ওয়াট মুখটা দেখতে দেখতে চল্লিশ ওয়াটে নেমে এলো। ফারিহা সেটা না দেখার ভান করে বলল, "তোমাকে সেই বাগানবাড়িতে এক রাত থেকে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিতে হবে। বলে দিতে হবে ওটা কী আসলেই ভূত নাকি অন্য কিছু!"

ছোটাচ্চুর মুখটা চল্লিশ ওয়াট থেকে আরো নিচে নেমে পঁচিশ ওয়াটের বাতির মতো টিমটিম করে জ্বলতে জ্বলতে একসময় পুরোপুরি ফিউজ হয়ে গেলে। ছোটাচ্চুর মুখটা দেখে ফারিহার রীতিমতো মায়া হচ্ছিল কিন্তু সে না দেখার ভান করল, বলল, "আমি তোমার পক্ষে সব কথা পাকা করে ফেলেছি।"

ছোটাচ্চু তার অন্ধকার মুখ নিয়ে বলল, 'পা-পা-পাকা করে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ। পরশু দিন একটা এসি মাইক্রোবাসে তোমার টিমকে নিয়ে যাবে। পরের দিন আবার নিয়ে আসবে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ওই পার্টির।"

ছোটাচ্চুর মুখটা আরো অন্ধকার হয়ে গেল। ফারিহা বলল, "আমি কোনো কাঁচা কাজ করি না। বলেছি, অর্ধেক এডভান্স করতে হবে, এক কথায় রাজি। চেক লিখে মেল করে দিয়েছে। কালকে পেয়ে যাবে।"

AMARBOI.COM

বেশ কিছুক্ষণ থেকে ছোটাচ্চু কথা বলার চেষ্টা করছিল, ফারিহা সুযোগ দিচ্ছিল না, এবারে একটু চেষ্টা করে বলল, "ওই লোক তোমার খোঁজ পেল কেমন করে?"

ফারিহা কথাটাকে খুব গুরুত্ব দিল না, হাত দিয়ে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "মনে হয় জানে তোমার সাথে আমার পরিচয় আছে। সেই জন্যে আমাকে মিসড কল দিয়েছে।"

"মিসড কল? এত বড় একটা ক্লায়েন্ট মিসড কল দেয়?"

"আরে মিসড কল হচ্ছে একটা কালচার। বড়-ছোটর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই!"

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ মুখটা অন্ধকার করে বসে থাকল, তারপর ফোঁস করে একটা বিশাল নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ওই পার্টি আগে আমাকে ফোন করেছিল।"

"সত্যি?" ফারিহা অবাক হবার একটা অসাধারণ অভিনয় করল।

"হ্যাঁ।" ছোটাচ্চু বলল, "আমি তাকে পরিষ্কার না করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—"

"কী বলেছিলে?"

"বলেছিলাম লাখ টাকা দিলেও এই ভূতের কেস নিব না।"

ফারিহা মধুর ভঙ্গি করে হাসল, বলল, "তুমি তোমার কথা রেখেছ। পার্টি লাখ টাকা দিবে না—অনেক কম দিবে!"

ছোটাচ্চু কেমন যেন ঘোলা চোখে ফারিহার দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যেবেলা টুনি ছোটাচ্চুকে দেখতে তার ঘরে গেল। ছোটাচ্চু তার বিছানায় পা ভাঁজ করে বসে আছে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র খবর পেয়েছে যে তার যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেছে। টুনিকে দেখে চিঁ চিঁ করে বলল, "টুনি।"

টুনি বলল, "কী হয়েছে ছোটাচ্চু?"

"খুবই খারাপ খবর।"

খারাপ খবর শুনলে চোখে-মুখে যে রকম ভাব করার কথা টুনি সে রকম ভাব করে বলল, "কী খারাপ খবর ছোটাচ্চু?"

"ফারিহা আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে।"

AMARBOI.COM

"ফারিহাপু? বিপদে? তোমাকে?"

"হ্যাঁ। একটা কেস নিয়ে নিয়েছে আমাকে জিজ্ঞেস না করে। আমি না করে দিয়েছিলাম।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী কেস ছোটাচ্চু?"

"একটা ভূতের বাড়ি চেক করে দেখতে হবে সত্যি না মিথ্যা।"

"নিশ্চয়ই মিথ্যা ছোটাচ্চু। সত্যি সত্যি তো আর ভূত নাই।"

"যদি থাকে? বুঝলি তো—এই ভূত-প্রেত, জীন-পরী আমার খুব খারাপ লাগে।"

টুনি কোনো কথা বলল না।

ছোটাচ্চু বলল, "যদি সত্যি সত্যি ভূত কিছু একটা করে ফেলে?"

"ভূত থাকলে নিশ্চয়ই ভূতের ওষুধও আছে।"

ছোটাচ্চু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "আমিও তাই বলছিলাম। ভূতের তাবিজ-কবজ নিশ্চয়ই আছে। আছে না?"

টুনি কী আর করবে, মাথা নাড়ল। ছোটাচ্চু বলল, "আমি তাই ভাবছিলাম খামাখা রিস্ক নিয়ে লাভ কী? একটা পীর-ফকিরকে খুঁজে বের করে একটা তাবিজ নিয়ে ফেলি, কী বলিস? যেতেই যখন হবে একটু সাবধানে যাই।"

টুনি আবার মাথা নাড়ল। ছোটাচ্চু চিঁ চিঁ করে বলল, "মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ভূত তাড়ানোর দোয়া-দরুদ জানে কি না।"

"দাদু কী বলেছে?"

"মা বলেছে আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিলে ভূত ধারে-কাছে আসতে পারে না।"

"তাহলে আয়াতুল কুরসিটা মুখস্থ করে ফেলো।"

ছোটাচ্চু মুখ শুকনো করে বলল, "চেষ্টা করে দেখেছি, মুখস্থ হতে চায় না।"

"তোমার ফোনে রেকর্ড করা যায় না? ফোনে রেকর্ড করে নাও, যখন দরকার পড়বে চালিয়ে দেবে।"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না।"

এর আগে ছোটাচ্চু যতবার তার ডিটেকটিভ কাজকর্ম করেছে ততবার বাচ্চা-কাচ্চাদের একশ' হাত দূরে রেখেছে, কাউকে ধারে-

AMARBOI.COM

কাছে আসতে দেয়নি। এই প্রথমবার দেখা গেল ছোটাচ্চু সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত। যেই যেতে চাইছে তাকেই ছোটাচ্চু নিয়ে যেতে রাজি হয়ে যাচ্ছে। এতজন বাচ্চা-কাচ্চাকে ছোটাচ্চু কেমন করে নিয়ে যাবে টুনি বুঝতে পারল না, সবাইকে নিতে হলে একটা মাইক্রোবাসে হবে না, একটা ডাবল ডেকার বাস লাগবে। বাচ্চা-কাচ্চাদের আব্বু-আম্মুরা নিজেদের বাসায় বাচ্চা-কাচ্চাদের ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় না কিন্তু এবারের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। অন্য কারো বাসাতে সবাই রাত কাটাবে, কোথায় ঘুমাবে, কী খাবে—এই সব নিয়ে তারা দুশ্চিন্তা করতে লাগল। এই বাসায় তাদেরকে কেউ দেখে রাখে না, তার দরকারও হয় না, কিন্তু সেই ভূতের বাড়িতে একজন বড় মানুষ দেখে না রাখলে বাচ্চা-কাচ্চাগুলো কী পাগলামো করে ফেলবে সেটা নিয়ে তাদের আব্বু-আম্মুরা চিন্তায় পড়ে গেল।

ঝুমু খালা তার সমাধান করে দিল। সবাই মিলে ভূতের বাড়ি যাচ্ছে শুনে সে একটা ঝাঁটা হাতে নিয়ে বলল সে সাথে যাবে আর এই ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে ভূতের গুষ্টিকে নির্বংশ করে দিবে। সাথে ঝুমু খালা থাকবে শুনে বাচ্চা-কাচ্চাদের আম্মু-আব্বুরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল—তার মতো কাজের মানুষ এই বাসায় আর কেউ নেই।

ঝুমু খালার এই বাসায় সপ্তাহখানেক থেকে তার নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার কথা ছিল কিন্তু দাদির সাথে তার একধরনের বন্ধুত্ব হয়ে যাবার জন্যে সে আর ফিরে যায়নি। সন্ধ্যার পর দাদির পায়ের কাছে বসে সে রসুন দেওয়া গরম সরিষার তেল দাদির পায়ে ডলে ডলে লাগাতে লাগাতে বাংলা সিরিয়াল দেখে এবং দুইজনে মিলে সিরিয়ালের যত চরিত্র আছে তাদের সমালোচনা করে। দাদি এবং ঝুমু খালার কথা শুনে মনে হতে পারে টেলিভিশনে বাংলা সিরিয়ালের চরিত্রগুলো সত্যিকারের মানুষ। রসুন দেওয়া সরিষার তেল মাখানোর কারণে দাদির শরীর থেকে এখন সবসময় কেমন যেন একধরনের কাবাবের গন্ধ বের হয়, দাদির অবশ্যি সেটা নিয়ে মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

ঝুমু খালার ঝাঁটা দেখে একজন বাচ্চা জিজ্ঞেস করল, "ঝুমু খালা, তুমি কেমন করে ঝাড়ু দিয়ে পিটাবে। ভূতকে তো দেখা যায় না।"

ঝুমু খালা বলল, "খালি চোখে দেখা যায় না। কলকের ভিতর দিয়ে তাকালে সব ভূত দেখা যায়।"

বাচ্চাদের বেশিরভাগই কলকে চিনে না, তাই ঝুমু খালাকে হুঁকো এবং কলকে ব্যাখ্যা করতে হলো। হুঁকো খাওয়ার বদলে মানুষজন সিগারেট খেয়ে যে পৃথিবীর কত বড় সর্বনাশ করে ফেলেছে ঝুমু খালা সেটা খুব জোর দিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিল।

একজন জিজ্ঞেস করল, "ঝুমু খালা, তুমি কখনো কলকের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে ভূত দেখেছ?"

"দেখি নাই আবার! একশ' বার দেখেছি। একশ' রকম ভূত দেখেছি।"

আরেকজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "দেখতে কী রকম?"

ঝুমু খালা হাত-পা নেড়ে বলল, "বেশিরভাগ ভূতের সাইজ হয় ছোট। তাদের ঘাড় নাই, ধড়ের উপর এই এত বড় মাথা। চোখগুলো লাল, নাক নাই, সেইখানে দুইটা গর্ত। মুখে মুলার মতন দাঁত, লম্বা জিব। হাত দুইটা হাঁটুর সমান লম্বা। দেখলে মনে হয় শরীর থেকে চামড়া তুলে নিয়েছে, সেইখানে আবার বিশ্রী গন্ধ। মড়া পোড়ালে যেরকম গন্ধ বের হয় সেইরকম।"

ঝুমু খালার বর্ণনা শুনে বেশিরভাগ বাচ্চার ভূত দেখার শখ মিটে গেল।

ভূতের বাড়ি যাবার জন্যে অনেকেই রেডি হয়ে থাকলেও যখন যাবার সময় হলো তখন তাদের সংখ্যা কমতে শুরু করল। যারা বেশি ছোট তাদের আম্মুরা ভেটো দিয়ে দিল। দেখা গেল অনেকেরই পরের দিন পরীক্ষা। সবচেয়ে উৎসাহী একজনের হঠাৎ করে একশ' তিন ডিগ্রি জ্বর উঠে গেল। একজনের পরের দিন তার প্রাণের বন্ধুর জন্মদিন, সেই জন্মদিনে না গেলে প্রাণের বন্ধুর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, তাই তার ভূতের বাড়ি যাবার আশা ছেড়ে দিতে হলো। তার দেখাদেখি অন্য কয়েকজনও ঠিক করল তারাও যাবে না। ভূতের বাড়িতে টেলিভিশন নাও থাকতে পারে আশঙ্কা করে টেলিভিশনের পোকা দুইজন পিছিয়ে গেল। তাদের দেখাদেখি অন্য দুইজন। কয়েকজন কোনো কারণ না দেখিয়ে পিছিয়ে গেল, তারা মুখে কিছু না বললেও অনুমান করা গেল ঝুমু খালার ভূতের বর্ণনা শুনে তারা যাবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে!

AMARBOI.COM

কাজেই পরের দিন যখন একটা মাইক্রোবাস সবাইকে ভূতের বাড়ি নিয়ে যেতে হাজির হয়েছে তখন মানুষজন খুবই কম। ছোটাচ্চু, শান্ত, টুনি এবং টুম্পা, তাদের সাথে ঝুমু খালা। ছোটাচ্চুর গলায় একটা বড় তাবিজ, সেটা ছোটাচ্চু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু কালো সুতার কারণে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ঝুমু খালা তার প্রিয় ঝাঁটাটা নিয়ে রওনা দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে বোঝানো গিয়েছে ভূতের বাড়িতে গিয়েও একটা ঝাঁটা পাওয়া যাবে। শান্ত একটা ক্রিকেট ব্যাট নিয়েছে—মোটেও ক্রিকেট খেলার জন্যে নয়—অস্ত্র হিসেবে। ক্রিকেট ব্যাটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না সেটা নিয়ে এখনো কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। টুনির ব্যাগে ঘুমের কাপড়, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান, তোয়ালে, নোট বই ছাড়াও আরো কিছু মাল-মসলা আছে, যেটা এখনো কেউ জানে না। সে আগের দিন বাজারে ঘোরাঘুরি করে সংগ্রহ করেছে। টুম্পা একটা মোটা গল্পের বই নিয়েছে, টুনির উপরে তার অনেক বিশ্বাস—টুনি বলেছে গল্প বই ছাড়া আর কিছুই নেবার দরকার নেই।

মাইক্রোবাসে ওঠার সময় শান্ত সবার আগে লাফিয়ে সামনের সবচেয়ে ভালো সিটটাতে বসে গেল। তার পাশে বসল ছোটাচ্চু। পিছনের সিটে টুনি আর টুম্পা। ঝুমু খালা ড্রাইভারের পাশের সিটে। মাইক্রোবাসটা ছাড়ার সময় ড্রাইভার খুব সন্দেহের চোখে ঝুমু খালাকে একনজর দেখে নিল, ঝুমু খালা তার চাইতেও বেশি সন্দেহের চোখে ড্রাইভারকে কয়েক নজর দেখে নিল!

মাইক্রোবাসটা ছেড়ে দেবার সাথে সাথে বোঝা গেল ড্রাইভার খুব বেশি কথা বলে। একজন যখন কথা বলে তখন অন্যদের সেই কথাটা শোনার কথা, প্রথমে কিছুক্ষণ তাই সবাই ড্রাইভারের কথা শোনার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই তারা হাল ছেড়ে দিল। তার কারণ ড্রাইভার গাড়ি ড্রাইভিং নিয়ে তার আলোচনাটা শুরু করল এইভাবে, "যখন ট্রেনে মানুষ কাটা পড়ে তখন কি ট্রেনের ড্রাইভারের নামে মামলা হয়? হয় না। তাহলে যখন মানুষ গাড়ির নিচে চাপা পড়ে তখন গাড়ির ড্রাইভারের নামে মামলা কেন হয়? কী যুক্তি? কোনো যুক্তি নাই। গাড়ির ড্রাইভারের নামে মামলা দেয়া ঠিক না। একজন ড্রাইভার যখন গাড়ি চালায় তখন সে কয়দিক দেখবে? রাস্তার মাঝে কি খালি গাড়ি?

AMARBOI.COM

না। রিকশা, টেম্পু, পাবলিক, গরু-ছাগল কি নাই? আমি আজ পনেরো বছর থেকে গাড়ি চালাই, আমি কি দেখেছি জানেন? গরু-ছাগলের বুদ্ধি পাবলিক থেকে বেশি। কোনোদিন শুনেছেন গাড়ি একসিডেন্টে গরু মরেছে? ছাগল মরেছে? শুনেন নাই। তার কারণ গরু-ছাগলের বুদ্ধি পাবলিক থেকে বেশি, তারা গাড়ির নিচে চাপা খায় না। পাবলিক রেগুলার চাপা খায়। দোষ হয় ড্রাইভারের। পৃথিবীতে কোনো ইনসাফ নাই। কোনো বিচার নাই। দেশের সব ড্রাইভার মিলে আন্দোলন করা দরকার, প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করা দরকার, গাড়ির ড্রাইভারদের ট্রেনের ড্রাইভারের সমান মর্যাদা দিতে হবে। গাড়ির একসিডেন্ট হলে গাড়ির ড্রাইভারদের কোনো দায়-দায়িত্ব নাই। তাদের নামে মামলা করা যাবে না। পাবলিক পিটা দিতে পারবে না—"

মিনিট দশেক সবাই ড্রাইভারের বকবকানি সহ্য করল, তারপর ঝুমু খালা ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল, "ড্রাইভার সাহেব।"

"বলেন।"

"আমার ব্যাগে একটা গামছা আছে।"

ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, "গামছা?"

"হ্যাঁ। যদি আপনি আর একটা কথা বলেন এই গামছা দিয়ে আপনার মুখটা বেনধে দিব। বুঝেছেন?"

ড্রাইভার অবাক হয়ে ঝুমু খালার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আপনে কথাবার্তা পছন্দ করেন না?"

"করি। কিন্তু—"

"মানুষ ছাড়া আর কোনো পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারের জবান আছে? নাই। এখন মানুষ যদি জবান ব্যবহার না করে, কথা না বলে তাহলে মানুষে আর জানোয়ারে কোনো পার্থক্য আছে? নাই।"

ঝুমু খালা বলল, "আপনি বিয়া করছেন? বউ আছে?"

ড্রাইভার থতমত খেয়ে বলল, "আছে। বউ আছে। বিয়া করেছি।"

"কয় নম্বর বউ?"

ড্রাইভার ভুরু কুঁচকে বলল, "কয় নম্বর বউ মানে?"

"মানে আপনার এক নম্বর বউ, নাকি দুই নম্বর বউ, নাকি তিন নম্বর?"

AMARBOI.COM

ড্রাইভার মুখ শক্ত করে বলল, "আপনি কেন এটা জিজ্ঞাসা করছেন?"

ঝুমু খালা বলল, "আপনি যত বেশি কথা বলেন আপনার কোনো বউ ছয় মাসের বেশি লাস্টিং করার কথা না। বড়জোর এক বছর।"

ড্রাইভার কোনো কথা বলল না। ঝুমু খালা বলল, "কী হলো কথা বলেন না কেন? কত নম্বর বউ?"

ড্রাইভার এবারেও কোনো কথা বলল না, শুধু নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করল। ঝুমু খালা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র না, মাথাটা ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকিয়ে বলল, "শরমের কী আছে? বলে ফেলেন!"

ড্রাইভার বলল, "আপনার মুখ খুব খারাপ। বড় বাজে কথা বলেন।"

ঝুমু খালা শব্দ করে হাসল, বলল, "সত্যি কথা বললে মুখ খারাপ হয়? ঠিক আছে আপনার কিছু বলতে হবে না। যা বোঝার আমরা সেটা বুঝে নিয়েছি। তয় ড্রাইভার সাহেব, আপনারে একটু উপদেশ দেই, যদি বউরে লাস্টিং করাতে চান, কথা কম বলবেন।"

ড্রাইভার সেই যে মুখ বন্ধ করল আর কথা বলল না। পিছনে বসে ছোটাচ্চু থেকে শুরু করে টুম্পা পর্যন্ত সবাই ঝুমু খালার ধারালো জিবটাকে মনে মনে স্যালুট দিল।

শহরের ভিড়, ট্রাফিক জ্যাম পার হয়ে যখন মাইক্রোবাসটা একটু ফাঁকা রাস্তায় উঠে গেল তখন সবাই ড্রাইভারের দ্বিতীয় এবং আসল গুণটার খবর পেল। তারা আবিষ্কার করল ড্রাইভার গুলির মতো মাইক্রোবাসটাকে রাস্তা দিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিতে শুরু করেছে। এরকম বিপজ্জনকভাবে যে গাড়ি চালানো যায় তারা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না।

বিপরীত দিক থেকে একটা ভয়ঙ্কর ট্রাক ছুটে আসছিল, মাইক্রোবাসের ড্রাইভার তার মাঝে রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটা বাসকে ওভারটেক করে সেই ভয়ঙ্কর ট্রাকের একেবারে গায়ে ঘষা দিয়ে বের হয়ে গেল। ছোটাচ্চু প্রায় চিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ।"

ড্রাইভার ছোটাচ্চুর চিৎকার শুনল বলে মনে হলো না, দৈত্যের মতো ছুটে আসা আরেকটা ট্রাকের দিকে মুখোমুখি ছুটে যেতে যেতে

একেবারে শেষ মুহূর্তে কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে গেল। ট্রাক ড্রাইভার পর্যন্ত চমকে উঠে বিকট সুরে হর্ন বাজাতে থাকল। ছোটাচ্চু আবার চিৎকার করে বলল, "ড্রাইভার সাহেব! সাবধান!"

'ড্রাইভার সাহেব' কোনো কথা বলল না, ছোটাচ্চুর কথা শুনেছে সেরকম ভাবও দেখাল না। ঠিক যেভাবে মাইক্রোবাস চালাচ্ছিল সেভাবে চালিয়ে যেতে থাকল, মনে হলো হঠাৎ করে স্পিড আরো বাড়িয়ে দিল। ছোটাচ্চু গলা উঁচিয়ে বলল, "ড্রাইভার সাহেব!"

ড্রাইভার মাথা ঘুরিয়ে বলল, "কী হইছে?"

"এইভাবে ড্রাইভ করছেন কেন? একটু সাবধানে চালান।"

ড্রাইভার আবার সামনে তাকিয়ে বলল, "কেন?"

"যে কোনো সময়ে একসিডেন্ট হবে!"

"একসিডেন্ট কি হয়েছে?"

"হয় নাই কিন্তু তার মানে এই না যে হতে পারে না। আপনি আস্তে চালান, সাবধানে চালান।"

ড্রাইভার মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "কোনো ভয় নাই। একসিডেন্ট হবে না। নিশ্চিত থাকেন।"

"আপনি যেভাবে চালাচ্ছেন যে কোনো সময়ে একসিডেন্ট হতে পারে।"

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, বলল, "আমি যেভাবেই চালাই কিছু আসে যায় না। কোনোদিন একসিডেন্ট হবে না।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"এই গাড়ির উপরে দোয়া আছে।"

"দোয়া?"

"জে।"

"সেটা কী রকম?"

ড্রাইভার মুখ গম্ভীর করে বলল, "চাক্কা পীরের নাম শুনেছেন?"

"চাক্কা পীর?"

"জে। চাক্কা পীর। চাক্কার উপরে চলে যত জিনিস তার সবকিছুর জন্যে এই পীরের তাবিজ আছে। একবারে জিন্দা তাবিজ। কোনো গাড়িতে যদি এই তাবিজ থাকে সেই গাড়ির কোনোদিন একসিডেন্ট হয় না।"

AMARBOI.COM

"আপনার গাড়িতে এই তাবিজ আছে?"

"জে।"

"কোথায়?"

ড্রাইভার হাত দিয়ে দেখাল, রিয়ার ভিউ মিরর থেকে বড়সড় একটা তাবিজ ঝুলছে। "মনে করেন আমি এখন আমার এই গাড়ি দিয়ে যদি সামনের ট্রাকের সাথে একসিডেন্ট করার চেষ্টা করি, এই গাড়ির কিছু হবে না—ঐ ট্রাক রাস্তা থেকে নিচে পড়ে যাবে।"

ছোটাচ্চু নিজে গলায় এত বড় একটা তাবিজ নিয়ে রওনা দিয়েছে এখন তাবিজের ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করে কেমন করে? তাই খালি দুর্বল গলায় বলল, "ট্রাকের সাথে লাগানোর চেষ্টা করবেন না প্লিজ!"

ড্রাইভার বলল, "কী বলেন স্যার! ঐ ট্রাকের ড্রাইভার-হেল্পারের জীবনের দাম আছে না?"

একটা বাসকে অসম্ভব বিপজ্জনকভাবে ওভারটেক করে সামনের দিক থেকে আসা আরেকটা বাসের একেবারে গা ঘেঁষে পাশ কাটিয়ে মাইক্রোবাসটা রাস্তার মাঝখানে একটা গর্তের উপর দিয়ে প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে গেল। মাইক্রোবাসের ভেতরে সবাই একবার ডান দিকে আরেকবার বাম দিকে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ছোটাচ্চু দুর্বলভাবে বলল, "আস্তে ড্রাইভার সাহেব! একটু আস্তে!"

ড্রাইভার বলল, "ভয় পাবেন না স্যার। আমার গাড়িতে চাক্কা পীরের তাবিজ! আমেরিকা থেকে গাড়ির কোম্পানির মালিক নিজে আসছিল চাক্কা পীর বাবার সাথে দেখা করতে।"

"কেন?"

"এই তাবিজ নিতে। গাড়ির কোম্পানি গাড়ি তৈরি করার সময় গাড়ির ভিতরে পাকাপাকিভাবে তাবিজ লাগিয়ে দিবে। গাড়ি আর একসিডেন্ট হবে না। চাক্কা পীর বাবা রাজি হয় নাই।"

"কেন রাজি হয় নাই?"

"চাক্কা পীর বাবা খালি নিজের দেশের খেদমত করতে চায়।"

"ও।"

ড্রাইভার বলল, "এই দেশের সরকার থেকে মন্ত্রী চাক্কা পীর বাবার কাছে আসছিল।"

"কেন?"

AMARBOI.COM

"চাক্কা পীর বাবার দোয়া নিতে। চাক্কা পীর বাবা মন্ত্রীরে কী বলেছেন জানেন?"

"কী বলেছেন?"

"ড্রাইভিং লাইসেন্সের সাথে সাথে সবাইরে একটা তাবিজ দিতে। তাহলে এই দেশে আর একসিডেন্ট হবে না।"

"মন্ত্রী রাজি হয়েছে?"

"জে রাজি হয়েছে। মনে হয় পার্লামেন্টে এইটা নিয়ে আলোচনা করে আইন পাস হবে।"

"ও।"

এরকম সময়ে টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চু বমি করব।"

টুম্পা কম কথার মানুষ, তাই তার কথাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়। বিশেষ করে যখন সে বমি করতে চায় এবং সত্যি সত্যি বমি করলে সেটা ছোটাচ্চুর ঘাড়ে করা হবে। ড্রাইভারের একসিডেন্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার তাবিজ আছে কিন্তু বমি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো তাবিজ নেই, তাই ছোটাচ্চু যখন বলল, "ড্রাইভার সাহেব গাড়ি থামান। একজন বমি করবে।" তখন ড্রাইভার সাথে সাথে তার গাড়ি থামাল।

যে বমি করবে তার গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নামার কথা কিন্তু টুম্পাকে খুব তাড়াহুড়া করতে দেখা গেল না, সে খুব ধীরে-সুস্থে নামল। নেমেই বমি করার কোনো লক্ষণ দেখাল না, এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। ঝুমু খালাও দরজা খুলে নেমে টুম্পার কাছে এসেছে, জিজ্ঞেস করল, "কী হলো বমি করবে না?"

"করব।"

"করো।"

টুম্পা বলল, "এই জায়গাটা ময়লা, আমি এইখানে বমি করব না।" বলে সে বমি করার জন্যে পরিষ্কার জায়গার খোঁজে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

বিষয়টা সবার কাছে খানিকটা বিচিত্র মনে হলেও আসলে এটা মোটেও বিচিত্র না, কারণ বমি করার এই নাটকটা এমনি এমনি হয়নি। ড্রাইভার যখন তার চাক্কা পীরের তাবিজের ওপর ভরসা করে

AMARBOI.COM

মাইক্রোবাসটাকে রীতিমতো উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন টুনি টুম্পাকে ফিসফিস করে বলল, "টুম্পা, তোকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"বমি করতে হবে।"

"কিন্তু আমার বমি পায় নাই।"

টুম্পা কেউ যেন শুনতে না পায় সেভাবে ফিসফিস করে বলল, "তোর আসলে বমি করতে হবে না। তুই খালি ভান করবি। আগে বলবি তোর বমি করতে হবে তারপর গাড়ি থেকে নামবি। ধীরে-সুস্থে নামবি। নেমে সময় নিবি। যখন আমি ডাকব তখন গাড়িতে ঢুকবি। এর আগে ঢুকবি না।"

অন্য যে কেউ হলে জিজ্ঞেস করত, "কেন?" টুম্পা জিজ্ঞেস করল না। টুনির ওপরে তার অনেক বিশ্বাস। কেন এই নাটকটা করতে হবে একটু পরে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। তাই যখন টুনি টুম্পাকে সিগন্যাল দিল, টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চু, বমি করব।"

টুম্পা বমি করার জন্যে সুন্দর জায়গা খুঁজে হাঁটতে থাকে আর ঝুমু খালা তাকে বমি করানোর জন্যে পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকে। ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কই যায়?"

টুনি বলল, "বমি করার জন্যে একটা ভালো জায়গা খুঁজছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "বমি করার জন্যে কারো ভালো জায়গা লাগে?"

"টুম্পার লাগে। টুম্পা খুবই খুঁতখুঁতে।"

তখন প্রথমে ছোটাচ্চু তারপর শান্ত তারপর গাড়ির ড্রাইভার মাইক্রোবাস থেকে নেমে গেল।

টুনি ঠিক এই সময়টার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কেউ যেন না দেখে সেভাবে একটু সামনে ঝুঁকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে ঝোলানো চাক্কা পীরের তাবিজটা খুলে নিল তারপর মুঠিতে ধরে সেও মাইক্রোবাস থেকে নেমে গেল।

টুম্পা তখনো হাঁটছে, টুনি চিৎকার করে বলল, "টুম্পা, বমি করলে করে ফেল তাড়াতাড়ি।"

টুম্পা তখন বসে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কয়েকবার 'ওয়াক ওয়াক' শব্দ করল। বমি করার খুব ভালো অভিনয় বলা যাবে না, কিন্তু কেউ শখ করে কখনো বমি করার অভিনয় করে না, তাই কেউ সন্দেহ করল না।

AMARBOI.COM

কিছুক্ষণ পর টুম্পা ঝুমু খালার হাত ধরে ফিরে আসল। টুম্পা চেহারার মাঝে একটা বিধ্বস্ত ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে রেখেছে। ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "বমি হয়েছে?"

ঝুমু খালা উত্তর দিল, "বেশি হয় নাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "না হলেই ভালো।"

টুনি বলল, "খোলা বাতাসে হাঁটাহাঁটি করলে বমি বমি ভাব কমে যায়।"

শান্ত বলল, "লুতুপুতু মানুষকে নিয়ে জার্নি করা ঠিক না।"

ছোটাচ্চু বলল, "থাক, থাক। ছোট মানুষ।" তারপর টুম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন যেতে পারবি?"

টুম্পা মাথা নেড়ে জানাল যে সে যেতে পারবে। তখন একজন একজন করে সবাই আবার মাইক্রোবাসে উঠে পড়ল। ড্রাইভার তার সিটে বসে আবার গাড়ি স্টার্ট করে। দেখতে দেখতে মাইক্রোবাসের স্পিড বাড়তে থাকে, সামনে যা কিছু আছে সবকিছু ওভারটেক করে ফেলে, উল্টো দিক থেকে যা কিছু আসে তার গা ঘেঁষে যেতে থাকে, মাঝে মাঝেই হেড লাইট জ্বালিয়ে-নিভিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে চোখ রাঙানি দিয়ে সামনে থেকে সরে যেতে বাধ্য করতে থাকে। ছোটাচ্চু কয়েকবার বলল, "আস্তে ড্রাইভার সাহেব, আস্তে।"

ড্রাইভার তার কথা শুনল না।

একটা বড় বাসকে ওভারটেক করে ড্রাইভার যখন গুলির মতো সামনে চলে গেল, ঝুমু খালা সিট ধরে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ড্রাইভার সাহেব।"

"কী হলো?"

"আপনার আসলে এরোপ্লেনের পাইলট হবার কথা ছিল। কপালের দোষে হয়েছেন গাড়ির ড্রাইভার।"

ড্রাইভার কোনো কথা না বলে বিষ দৃষ্টিতে একবার ঝুমু খালার দিকে তাকাল। ঝুমু খালা বলল, "আপনারে মনে হয় কেউ এখনো বলে নাই, আপনার গাড়ির কিন্তু দুই দিকে পাখা নাই। যত জোরেই চালান এইটা কিন্তু আকাশে উড়বে না।"

ড্রাইভার মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আপনার মুখ খুব খারাপ।"

ঝুমু খালা বলল, "গরিবের পরিবার। জন্মের সময় বাপে মধু কিনে আনতে পারে নাই। বাড়িতে কাঁচা মরিচ ছিল, মুখে সেইটাই দিছিল। তাই আমার মুখ এত খারাপ। মুখে মিষ্টি কথা আসে না।"

"মিষ্টি কথা না আসলে চুপ করে থাকেন। ঝাল কথা বলতে হবে কেন?"

"তার কারণ গাড়ি একসিডেন্ট হলে আপনি একলা মরবেন না তার সাথে আমরা সবাই মরব। আপনি মরতে চান মরেন, বাড়িতে গিয়ে গলায় দড়ি দেন। কিন্তু আমাদের সবাইরে আপনি মারতে পারবেন না।"

ড্রাইভার গলা উঁচিয়ে বলল, "আপনারে কতবার বলব আমার গাড়িতে চাক্কা পীরের তাবিজ আ—" কথা বলার সময় চোখের কোনা দিয়ে তাবিজটা একনজর দেখতে গিয়ে যেই আবিষ্কার করল রিয়ার ভিউ মিররে ঝোলানো তাবিজটা নেই, তাই সে কথা শেষ না করে মাঝখানে থেমে গেল। হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে বলল, "তা-তা-তাবিজ! আমার তাবিজ!"

সবাই তখন দেখল যেখানে একটা তাবিজ ঝুলছিল সেখানে কিছু নেই। কীভাবে সেটা ঘটেছে সেটা এখন টুম্পা হঠাৎ করে বুঝে গেল। সে টুনির দিকে তাকাল, টুনি চোখ টিপে মুচকি হাসল।

ঝুমু খালা চিৎকার করে বলল, "আপনার তাবিজ কই গেল?

ড্রাইভার খুব তাড়াতাড়ি গাড়িকে থামিয়ে এনে রাস্তার পাশে দাঁড়া করিয়ে গাড়ির ভিতরে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে। হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "আমার তাবিজ! আমার চাক্কা পীরের তাবিজ!"

ঝুমু খালা বলল, "আপনি বলছিলেন আপনার তাবিজ জিন্দা। সেই জন্যে মনে হয় উড়ে উড়ে চলে গেছে।"

সবাই ভাবল ঝুমু খালার টিটকারি শুনে ড্রাইভার বুঝি রেগে উঠবে। ড্রাইভার রাগল না, চোখে-মুখে গভীর একটা দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বলল, "আপনি আমার সাথে মশকরা করছেন। কিন্তু এই তাবিজ আসলেই জিন্দা। বিনা অজুতে এই তাবিজ ছুঁতে হয় না। এই তাবিজের অপমান করলে তাবিজ গায়েব হয়ে যায়। আপনারা সবাই এই তাবিজের বেইজ্জতি করেছেন, তাবিজ গোসা করে গায়েব হয়ে গেছে। হায়রে হায়!"

ঝুমু খালা বলল, "আমরা কখন আপনার তাবিজের বেইজ্জতি করলাম?"

"একটু পরে পরে বলেছেন একসিডেন্ট হবে একসিডেন্ট হবে, সেইটা তাবিজের বেইজ্জতি হলো না?"

ছোটাচ্চু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "ঠিক আছে ড্রাইভার সাহেব বেইজ্জতি হলে হয়েছে। এখন রওনা দেন।"

শান্ত বলল, "এখন আপনার জিন্দা তাবিজ নাই, তাই আস্তে আস্তে চালাবেন।"

ড্রাইভার ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "নিশানা খুব খারাপ। চাক্কা পীরের তাবিজ নাই, ভালো-মন্দ কিছু একটা না হয়ে যায়!"

ঝুমু খালা বলল, "হবে না। আপনি ড্রাইভার ভালো, এতক্ষণ গাড়ি উড়ায়ে নিচ্ছিলেন, এখন রাস্তার উপর দিয়ে নিবেন।"

ড্রাইভার মুখটা কালো করে তার সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট করল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেল খুবই সাবধানে, কোনো বিপজ্জনক ওভারটেক করল না, বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা কোনো গাড়িকে হেড লাইট জ্বালিয়ে-নিভিয়ে চোখ রাঙানি দিল না। কোনো বাস কিংবা ট্রাকের একেবারে গা ঘেঁষে পার হলো না, হর্ন বাজিয়ে কারো কান ঝালাপালা করল না। এক কথায় বলা যায়, সবাই খুবই শান্তিতে পুরো রাস্তা পার করল।

বেশি সাবধানে গাড়ি চালানোর কারণে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল, যখন শেষ পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে মাইক্রোবাসটি ভূতের বাড়ি পৌঁছেছে তখন বিকেল হয়ে গেছে।

এই বাগানবাড়িটি আগে কেউ দেখেনি, সবাই এটাকে ভূতের বাড়ি বলে এসেছে। বাগানবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো এটা বুঝি আসলেই একটা ভূতের বাড়ি। পুরানো একটা দোতলা বাসা, চারপাশে বড় বড় গাছ দিয়ে ঢাকা। বড় বড় গাছের কারণে দিনের বেলাতেই আবছা অন্ধকার। সামনে বড় বারান্দা, ভারী কাঠের পুরানো আমলের দরজা-জানালা। পুরানো দেয়াল থেকে জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। দালান বেয়ে বেয়ে কিছু কিছু লতানো গাছ উঠে গেছে।

দালানটির ঝকঝকে-তকতকে ভাবটি নেই কিন্তু সে জন্যে এটাকে খারাপ লাগছে না, বরং এর মাঝে অন্য একধরনের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

গাড়ির শব্দ শুনে পিছন থেকে একজন মাঝবয়সী মানুষ হাজির হলো। মনে হয় এই বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার। ছোটাচ্চুকে একটা সালাম দিয়ে বলল, "আমার স্যার ফোন করে আমাকে বলেছেন আপনারা দুপুরে আসবেন।"

"হ্যাঁ। আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।"

"স্যার বলেছিলেন আপনারা ডিটেকটিভ। এখন তো দেখি সবাই পোলাপান।"

"আমি এসেছি ডিটেকটিভের কাজে। আর অন্যেরা আসছে বেড়াতে।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "ভালো। ভালো। খুব ভালো। এই জায়গাটা বেড়ানোর জন্যে খুব ভালো।"

ছোটাচ্চু বলল, "কিন্তু শুনেছি এই বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে?"

মানুষটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "এই যুগে কেউ ভূত বিশ্বাস করে? ওগুলো বাজে কথা। এই সুন্দর জায়গাটার একটা বদনাম দেবার জন্যে লোকজন এই কথা ছড়ায়।"

"এর আগে কারা এসেছিল, রাতে নাকি তারা ভূতের ভয় পেয়েছে?"

মানুষটা মুখ গম্ভীর করে বলল, "সেটা আমি জানি না, আমাকে কিছু বলে নাই। কোনো পার্টি মনে হয় বাড়ি কিনতে এসেছিল, কম দামে কিনতে চায় তাই এই কথা ছড়িয়েছে। ভেবেছে ভূতের কথা বললে বাড়ি সস্তায় দিবে।"

বাড়িটাতে আসলে ভূতের কোনো উৎপাত নেই শুনে ছোটাচ্চু খুব খুশি হয়ে উঠল। বলল, "যদি ভূতের কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে আমাকে খামাখা কেন টেনে আনল?"

"এসেছেন যখন দুই-এক দিন থেকে বেড়িয়ে যান! ভালো লাগবে!"

"সেইটা অবশ্যি ঠিকই বলেছেন। এরকম সুন্দর জায়গায় দুই-এক দিন থাকলে আসলেই খুব ভালো লাগবে। কিন্তু সেই কপাল তো নাই।

AMARBOI.COM

সবাই ব্যস্ত, আজকের রাতটা শুধু থাকতে পারব, কালকেই চলে যেতে হবে।"

"ঠিক আছে, এক দিনই না হয় থাকলেন। আপনাদের ব্যাগগুলো দেন, ভিতরে নিয়ে যাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমাদের এমন কিছু ব্যাগ-স্যুটকেস নাই, নিজেরাই নিতে পারব।"

তারপরও কেয়ারটেকার মানুষটা টুম্পা আর টুনির ব্যাগ দুটো দুই হাতে করে ভিতরে নিয়ে গেল।

বাইরে যেরকম গা ছমছমে ভাব আছে, ভিতরে সেরকম নেই। মাঝখানে একটা ড্রইংরুমের মতো, সেখানে সুন্দর সোফা। এক পাশে একটা লাইব্রেরির মতো, আলমারির ভেতরে অনেক বই, পুরানো আমলের বাঁধাই। মোটা মোটা বইয়ের গায়ে সোনালি রং দিয়ে বইয়ের নাম লেখা, বেশিরভাগই ইংরেজি। অন্যপাশে ডাইনিং রুম। বড় ডাইনিং টেবিল ঘিরে পুরানো আমলের কাঠের চেয়ার।

ঘরের মাঝখান দিয়ে চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দোতলায় দুই পাশে দুটি বেডরুম, প্রত্যেকটা বেডরুমে দুটি করে পরিপাটি বিছানা। বেডরুমের সাথে লাগানো বাথরুম। বাথরুমে পরিষ্কার টাওয়েল, নতুন সাবান। দুই বেডরুমের মাঝখানে একটা লিভিং রুম। সেখানে বসার জন্য সোফা, কফি টেবিল। কফি টেবিলের উপর কিছু পুরানো ম্যাগাজিন। লিভিং রুমের এক পাশে একটা বেসিন। ট্যাপ খোলার পর ঘর্ঘর একটু শব্দ করে পানি বের হয়ে এলো। ঘরের অন্য কোনায় একটা পুরানো টেলিভিশন।

শান্ত প্রথমেই ডান দিকের বেডরুমের জানালার কাছে সবচেয়ে ভালো বিছানাটা দখল করে নিল! অন্যটাতে ছোটাচ্চু। বাম দিকের বেডরুমের একটাতে ঝুমু খালা অন্যটাতে টুনি আর টুম্পা। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নেমে আসে, ডাইনিং টেবিলে চা-নাস্তা দেয়া হয়েছে। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করে কিছু খেয়ে মাইক্রোবাস নিয়ে ফিরে চলে গেল। পরের দিন সকালবেলা তাদের নিয়ে যেতে আসবে। তাবিজ হারানোর পর থেকে তার মুখের দিকে তাকানো যায় না।

ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে খেতে কেয়ারটেকারের সাথে কথাবার্তা হলো। তার নাম রমজান আলী। এই বাগানবাড়ির পিছনেই একটা ছোট

AMARBOI.COM

দোচালায় সে তার বউকে নিয়ে থাকে। তাদের বাচ্চা-কাচ্চা নেই, ছোট শালা তাদের সাথে থাকে। ছোট শালা কলেজে পড়ে, বি.এ. পরীক্ষা দিবে। ডাইনিং টেবিলে যে নাস্তা দেয়া হয়েছে সেগুলো তার বউ তৈরি করেছে। বউ ভালো রান্না করতে পারে, এই বাগানবাড়িতে যখন কেউ আসে তখন তার বউ রান্না করে। স্বামী-স্ত্রী এই দুজনে মিলে তারা বাগানবাড়িটা দেখে-শুনে রাখে। কেউ বেড়াতে না এলে তাদের আলাদা কাজ নেই কিন্তু এই বড় বাড়িটা দেখে-শুনে রাখাই অনেক কাজ।

খাওয়া শেষে রমজান আলী ডাইনিং টেবিল থেকে কাপ-পিরিচ-বাটি-প্লেট তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, "রাত্রে কী খাবেন?"

শান্ত বলল, "পিতজা। আপনার বউ পিতজা বানাতে পারে?"

রমজান আলী থতমত খেয়ে বলল, "জে না। এটার তো নামও শুনে নাই।"

শান্ত হতাশ হয়ে বলল, "তাহলে আর লাভ কী হলো?"

রমজান আলী বলল, "এখানে ভালো মাছ পাওয়া যায়—"

শান্ত বলল, "নো মাছ। বাসায় আম্মু জোর করে মাছ খাওয়ায়। এখানে মাছ খাব না।"

"তাহলে মুরগির মাংস?"

শান্ত বলল, "দেশি মুরগি? অরিজিনাল বাংলাদেশি পাসপোর্ট?"

খাওয়ার মেন্যু নিয়ে আলোচনা যখন আরো জটিল হয়ে উঠল তখন টুনি উঠে পড়ল, তার দেখাদেখি টুম্পা। খাওয়া নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, যত আলোচনা হোক শেষ পর্যন্ত খেতে হবে ভাত, সবজি, ডাল সাথে মাছ না হয় মাংস! এর মাঝে এত আলোচনার কী আছে?

টুনিকে উঠতে দেখে ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কই যাস?"

টুনি বলল, "যাই একটু ঘুরে দেখি।" দিনের আলো থাকতে থাকতে সে পুরো এলাকাটা দেখতে চায় সেটা আর বলল না।

ছোটাচ্চু বলল, "অপরিচিত জায়গা, বেশি দূর যাবি না।"

টুনি মাথা নাড়ল, সে শুধু শুধু বেশি দূর কেন যাবে? এটি হচ্ছে বড় মানুষদের অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় উপদেশ।

বাগানবাড়ি থেকে বের হয়ে টুনি পুরো বাড়িটা একবার ভালো করে দেখে। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "কী দেখো টুনি আপু?"

AMARBOI.COM

"এই বাড়িটাতে ইলেকট্রিসিটি আছে। যে বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি থাকে সেখানে ভূত কীভাবে আসবে? ভূতকে আসতে হয় অন্ধকারে। কোনোদিন শুনেছিস দিনের বেলা ভূত এসেছে? শুনেছিস যখন অনেক আলো তখন ভূত এসেছে?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, সে আসলে কখনোই ভূত নিয়ে কিছু শুনেনি। আলোতে এসেছে শুনেনি, অন্ধকারে এসেছে সেটাও শুনেনি।

টুনি বলল, "তার মানে হচ্ছে এই বাসায় ভূত আসতে হলে প্রথমে ইলেকট্রিসিটিটা বন্ধ করতে হবে। তার মানে বুঝেছিস?"

টুম্পা মাথা নেড়ে জানাল, সে বুঝেনি।

"তার মানে আমাদের মেইন সুইচটা খুঁজে বের করতে হবে। ভূতকে প্রথমে মেইন সুইচ অফ করতে হবে। আয় এটা খুঁজে বের করি।"

টুনি টুম্পাকে নিয়ে বাড়িটার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পিছন দিকে একটা ছোট ঘর খুঁজে বের করল, এর ভিতরে মিটার এবং তার পাশে কয়েকটা সার্কিট ব্রেকার। টুনি কিছুক্ষণ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে টুম্পাকে বলল, "তুই বাইরে পাহারা দে। যদি দেখিস কেউ আসছে তাহলে শব্দ করে কাশবি।"

অন্য যে কেউ হলে জিজ্ঞেস করত টুনি ভিতরে কী করবে, টুম্পা জিজ্ঞেস করল না। সময় হলেই সে নিজের চোখে দেখবে। টুনি আপুর উপরে তার অনেক বিশ্বাস।

টুম্পাকে কাশতে হলো না, টুনি কিছুক্ষণের মাঝেই বের হয়ে এলো।

পুরো বাড়িটা চক্কর দিতে দিতে তারা বাড়ির পিছনে হাজির হলো। দুই পাশের দুটি গাছের ডালের সাথে একটা দড়ি বেঁধে সেখানে কাপড় শুকাতে দিয়েছে। একটা শাড়ি, একটা লুঙ্গি, দুইটা টি-শার্ট, একটা ব্লাউজ। টুনি বলল, "এই কাপড়গুলো দেখেই বুঝতে পারবি এই বাড়িতে কয়জন কী রকম মানুষ থাকে।"

"কীভাবে?"

শাড়ি-ব্লাউজ দেখে বোঝা যাচ্ছে একজন মহিলা আছে। শাড়িটা রঙিন, তার মানে কমবয়সী মহিলা। আমাদের কেয়ারটেকার রমজান আলীর বউ। লুঙ্গিটা নিশ্চয়ই রমজান আলীর। টি-শার্ট দেখেই বোঝা

AMARBOI.COM

যাচ্ছে স্কুল-কলেজের ছেলে আছে। এটা হচ্ছে রমজান আলীর শালা। কোনো ছোট ছেলে-মেয়ের জামা-কাপড় নাই, তার মানে বাচ্চা-কাচ্চা নাই।"

টুম্পা চমৎকৃত হলো, বলল, "টুনি আপু, তুমি জিনিয়াস!"

"এইটা জিনিয়াস না। যদি ভূতকে ধরতে পারি তাহলে বলিস জিনিয়াস।"

"ভূতকে ধরে কী করবে?"

"সেটা নির্ভর করে ভূতের সাইজের উপর। ছোটখাটো হলে বোতলে ভরে নিয়ে যাব।"

টুম্পা কথা বলে কম, হাসে আরো কম। এবারে টুনির কথা শুনে সে হি হি করে হেসে উঠল।

আরেকটু হাঁটতেই টুনি আর টুম্পা কেয়ারটেকার রমজান আলীর বাড়িটা দেখতে পেল। তকতকে একটা বাসা, বাসার সামনে সবজির বাগান। তারা আরেকটু এগিয়ে যায়, একটা জানালা দিয়ে একটা বউ বাইরে তাকিয়ে ছিল, টুনি আর টুম্পাকে দেখে সরে গেল।

টুনি বলল, "আয় যাই। এই বউটা লাজুক, আমাদের সাথে কথা বলতে চায় না।"

দুজনে আবার বাগানবাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে। টুম্পার চোখে এটা পুরানো একটা বাড়ি ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু টুনির চোখে মনে হয় আরো অনেক কিছু ধরা পড়েছে, সে মাঝে মাঝেই কিছু একটা দেখে সবকিছু বুঝে ফেলার মতো মাথা নাড়তে থাকে। কী দেখে মাথা নাড়ছে টুম্পা জানার চেষ্টা করে না—তাকে জানানোর মতো কিছু হলে টুনি নিজেই তাকে জানিয়ে দেবে।

সন্ধ্যে হওয়ার পর শান্ত বলল, "শুধু শুধু এখানে এসে সময় নষ্ট। এখানে কিছুই করার নাই।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করতে চাচ্ছিস?"

"সেটা জানি না। তুমি বলেছিলে এখানে ভূত আছে। এখন রমজান চাচা বলছে ভূত নাই। ভূত যদি না থাকে তাহলে এসে লাভ কী?"

টুনি বলল, "ভূত তো আর রমজান চাচার পোষা ভূত না।"

AMARBOI.COM

"মানে?"

"রমজান চাচা না বললেই ভূত থাকবে না কে বলেছে? থাকতেও তো পারে।"

শান্ত ভুরু কুঁচকে বলল, "তোর কী মনে হয়? ভূত আছে?"

টুনি উত্তর দেবার আগেই ঝুমু খালা বলল, "আছে।"

"আছে?" শান্ত চমকে উঠে বলল, "তুমি কেমন করে জানো?"

"বাতাসটা টের পাও না?"

"বাতাস? ভূতের বাতাস আছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কী রকম?"

"ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। দেখবা হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগবে। তখন বুঝবা তেনারা আছে আশেপাশে।"

"তুমি টের পাচ্ছ?"

ঝুমু খালা বলল, "বাড়িটাতে ঢুকেই আমার মনে হয়েছে এইখানে কিছু একটা আছে।"

শান্ত হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেল। অল্পতেই চমকে উঠতে লাগল। যেখানে সবাই বসে আছে সেখান থেকে নড়ল না।

AMARBOI.COM

রাতের খাওয়াটা খুব ভালো হলো। রমজান আলী ভুল বলেনি, তার বউ আসলেই খুব ভালো রান্না করে। টুনি ভেবেছিল নানা রকম আলোচনার পর তাদের সেই পুরাতন ভাত-মাছ-ডালই খেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল খাবার মেন্যু খুবই চমকপ্রদ—পরাটা এবং শিক কাবাব। পাশাপাশি সবজি এবং ঘন ডাল, তার সাথে দই এবং মিষ্টি। পরাটাগুলো খুবই ভালো, মোটেও তাদের বাসার তৈরি পরাটার মতো না। খাওয়া শেষে চা এবং কফি। চা মোটেও সাধারণ চা নয়, মসলা দেয়া একধরনের পায়েসের মতো চা। খেয়ে টুম্পা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। ঝুমু খালা খাওয়া শেষে রমজান আলীকে বলল, "আপনার বউয়ের রান্নার হাত খুব ভালো। এই সব বড়লোকি রান্না সবাই জানে না। কোথায় শিখেছে?"

কেয়ারটেকার রমজান আলী বলল, "এই তো!"

"বউয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন। আপনার বউ চলে গেলে এইখানে আপনার চাকরিও নট হয়ে যাবে!"

রমজান আলী কিছু বলল না।

খাওয়ার পর সবাই আবিষ্কার করল কারো কিছু করার নেই। শুধু বুদ্ধিমান টুম্পার কাছে মোটা একটা গল্পের বই। সে মশারির ভেতর ঢুকে সেটা মন দিয়ে পড়ছে। অন্যেরা ঘরের ভেতরে এদিক-সেদিক একটু হাঁটাহাঁটি করল, টেলিভিশনটা চালু করার চেষ্টা করল। খুবই আবছাভাবে বিটিভির চাষবাসসংক্রান্ত একটা অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে শোনা গেল, কিন্তু সেটা দেখে সময় কাটানো সম্ভব না। শান্ত কিছুক্ষণ গজগজ করল তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

রমজান আলী সবার ঘরে পানির বোতল আর গ্লাস দিয়ে চলে যাবার সময় ছোটাচ্চুকে বলে গেল, "এখানে লোডশেডিং হয় দিনের বেলা। রাত্রে কারেন্ট যায় না।"

ছোটাচ্চু বলল, "গুড।"

রমজান আলী বলল, "যদি কারেন্ট চলে যায় আর মোমবাতি লাগে সেজন্যে মাঝখানের ঘরে টেলিভিশনের উপরে রেখে গেলাম। মোমবাতি আর দিয়াশলাই।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "মাঝখানের ঘরে কেন?"

রমজান আলী মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কয়দিন আগে একজন মোমবাতি দিয়ে মশারিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, সে জন্যে।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক আছে। আমরা এখন ঘুমিয়ে যাব। রাত্রে ভূত যদি উৎপাত না করে ঘুম থেকে ওঠার কোনো প্ল্যান নাই।"

মশারির ভেতর থেকে শান্ত বলল, "আমি আমার ব্যাট নিয়ে শুয়েছি। ভূত আসলে এমনি এমনি ছেড়ে দিব না।"

রমজান আলী বলল, "আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই। ভূত বলে কিছু নাই! যদি থাকে সেইটা হচ্ছে মানুষের মনে।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমার মন নিয়ে কোনো সমস্যা নাই।"

রমজান আলী বলল, "আমি গেলাম, আপনারা ভিতর থেকে দরজায় ছিটকানি দিয়ে দেন।"

ঝুমু খালা নিচে নেমে দরজায় ছিটকানি দিয়ে প্রত্যেকটা দরজা-জানালা পরীক্ষা করল। দরজাগুলো বন্ধ। জানালায় শক্ত লোহার শিক, ফাঁক দিয়ে ভূত চলে আসতে পারলেও চোর-ডাকাত আসতে পারবে না।

যখন সবার মনে হলো নিশুতি রাত হয়েছে তখন সবাই বিছানায় ঘুমাতে গেল। ছোটাচ্চু অবাক হয়ে দেখল ঘড়িতে মাত্র রাত দশটা বাজে। সারাদিন জার্নি করে এসেছে বলেই হোক, রাতের ভালো খাবারের জন্যেই হোক কিংবা ভূতের ভয়েই হোক, সবাই বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেল।

কতক্ষণ পর কেউ জানে না, সবার আগে ঘুম থেকে জেগে উঠল টুম্পা, 'ধুম' করে শব্দে মনে হলো বাড়িটা কেঁপে উঠেছে। টুম্পা লাফ দিয়ে উঠে বসে টুনিকে ধাক্কা দিল, "টুনি আপু!"

টুনি জেগে উঠে বলল, "কী হয়েছে?"

কী হয়েছে সেটা আর টুম্পাকে বলে দিতে হলো না, কারণ ঠিক তখন আবার 'ধুম' করে বিকট একটা শব্দ হলো।

শব্দের কারণটাও এবারে অনুমান করা গেল। বাড়িটায় টিনের ছাদ, সেই ছাদে কেউ ঢিল মারছে। তৃতীয় ঢিলটা পড়ার পর অন্য সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠল। ঝুমু খালা মশারি থেকে বের হয়ে কোমরে শাড়ির আঁচলটা বেঁধে বলল, "কোন বান্দীর পুলা ঢেলা মারে?"

টুম্পা ভয়ে ভয়ে বলল, "ভূত?"

ঝুমু খালা বলল, "ভূতে কোনোদিন ঢেলা মারে না। ঢেলা মারে মানুষ।"

তখন চতুর্থ ঢিলটা এসে পড়ল, এটার সাইজ নিশ্চয়ই অনেক বড়, কারণ মনে হলো পুরো বাড়িটা কেঁপে উঠল। সেই বিকট শব্দের সাথে সাথে ছোটাচ্চু আর শান্তও সমান জোরে চিৎকার করে উঠল, তারপর দুপদাপ শব্দ করে টুনিদের ঘরে ছুটে এলো। শান্ত তার হাতে ব্যাটটা ধরে রেখেছে আর ছোটাচ্চু দুই হাত দিয়ে তার তাবিজটা ধরে রেখেছে।

ছোটাচ্চু ঘরে ঢুকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কোনো ভয় নাই। কোনো ভয় নাই।"

ঝুমু খালা বলল, "হ্যাঁ, কেউ ভয় পাবা না। এইটা ভূতের কাম না, এইটা হচ্ছে মানুষের কাম। বদ মানুষের কাম। ঢেলা মারতে মারতে যখন হাতে বেদনা হবে তখন ঢেলা মারা বন্ধ করে বাড়িতে যাবে।"

ঝুমু খালার কথা শেষ হবার সাথে সাথে দুইটা বড় বড় ঢিল ছাদে এসে পড়ল আর হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। শান্ত চিৎকার করে বলল, "কারেন্ট চলে গেছে।"

ছোটাচ্চু কাঁপা গলায় বলল, "জানি।"

শান্ত বলল, "অন্ধকার চারিদিক।"

ছোটাচ্চু বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

শান্ত ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এখন কী করব?"

"লিভিং রুমে টেলিভিশনের উপরে মোমবাতি আছে।"

ঝুমু খালা বলল, "সবাই চলো। মাঝখানের ঘরে সবাই একসাথে থাকি।"

ছোটাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। সবাই একসাথে।"

সবাই হাতড়াতে হাতড়াতে এগুতে থাকে। এর মাঝে টুনি অন্ধকারের মাঝেই তার ব্যাগটা নিয়ে নেয়। এর মাঝে তার দরকারি জিনিসপত্র আছে।

মাঝখানের ঘরে গিয়ে সত্যি সত্যি টেলিভিশনের উপরে দুইটা মোমবাতি পাওয়া গেল। মোমবাতির পাশে একটা ম্যাচও রাখা আছে। ছোটাচ্চু মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দিল। অন্ধকারে একধরনের আতঙ্ক হচ্ছিল। মোমবাতির আবছা আলোতে সেই আতঙ্ক না কমে কেমন যেন আরো বেড়ে গেল। দেওয়ালে তাদের বড় বড় ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াগুলো যখন হঠাৎ হঠাৎ করে নড়তে থাকে তখন নিজেরাই নিজের ছায়া দেখে চমকে চমকে ওঠে।

সবাই ঘরের মেঝেতে গোল হয়ে বসেছে। ছোটাচ্চু ডান হাত দিয়ে তার তাবিজটা ধরে রেখেছে। ঝুমু খালা যদিও বলছে এটা ভূতের কাজ নয়, কোনো পাজি মানুষ ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, তারপরও ছোটাচ্চু কোনো ঝুঁকি নিল না, শক্ত করে তাবিজটা ধরে রাখল।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ তারা শুনল একটা গাছের ডাল হঠাৎ করে নড়তে শুরু করেছে। খোলা জানালা দিয়ে আবছা আবছা দেখা যায় আশেপাশে সব গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু একটা গাছের একটা ডাল ভীষণভাবে দুলছে। ঝুমু খালা বলল, "মনে হয় বান্দর।"

ছোটাচ্চু বলল, "বানর? বানর কোথা থেকে এসেছে?"

শান্ত ভয় পাওয়া গলায় বলল, "বানর না, এটা নিশ্চয়ই ভূত।"

গাছের ডালটা যেভাবে হঠাৎ করে নড়তে শুরু করেছিল ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে থেমে গেল। যখন সবাই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করছে তখন হঠাৎ করে অন্য পাশের আরেকটা গাছের একটা ডাল দুলতে থাকে। একটু বাতাস নেই, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না, তার মাঝে শুধু একটা গাছের একটা ডাল এভাবে নড়ছে, দেখে সবার বুক কেঁপে ওঠে। ঝুমু খালা পর্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেল, কাঁপা গলায় বলল, "ইয়া মাবুদ! মনে হয় তেনারাই আসছেন!"

শান্ত বলল, "তেনারা কারা?"

ঝুমু খালা বলল, "রাত্রি বেলা তেনাদের নাম নেওয়া ঠিক না।"

"তাহলে কী করব?"

"আয়াতুল কুরসি পড়ো।"

"আমার তো মুখস্থ নাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমার মোবাইলে রেকর্ড করা আছে।"

ঝুমু খালা বলল, "দেরি কইরেন না, চালান। তাড়াতাড়ি চালান।"

ছোটাচ্চু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তার মোবাইল ফোন বের করে সেখানে রেকর্ড করে রাখা আয়াতুল কুরসিটা চালানোর চেষ্টা করল। কোথায় রেকর্ড করেছে মনে নেই, এখন ভয় আর উত্তেজনায় সেটা খুঁজে পাচ্ছে না, কিছু একটা টিপতেই বিকট সুরে হেভি মেটাল গান শুরু হয়ে গেল।

ঝুমু খালা বলল, "মনে হয় এই গান শুনলেও তেনারা ধারে-কাছে আসবে না। কিন্তু আয়াতুল কুরসি নাই?"

"আছে আছে। খুঁজে পাচ্ছি না।" ছোটাচ্চু যখন তার মোবাইলে রেকর্ড করে রাখা আয়াতুল কুরসি খুঁজছে তখন হঠাৎ করে গাছের ঝাঁকুনিটা থেমে গেল। চারিদিকে একটা সুনসান নীরবতা, সেটা মনে হয় আরো বেশি ভয়ের। সবাই যখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে তখন হঠাৎ দপদপ করে কয়েকবার জ্বলে উঠে একটা মোমবাতি নিভে গেল। ছোটাচ্চু চিৎকার করে বলল, "কী হলো? মোমবাতি নিভে গেল কেন?"

ঝুমু খালা বলল, "নিশানা ভালো না। দোয়া-দরুদ পড়েন।"

ঠিক তখন দ্বিতীয় মোমবাতিটাও দপদপ করে কয়েকবার জ্বলে ওঠে, তারপর মোমবাতির শিখাটা কমতে কমতে হঠাৎ করে পুরোপুরি

নিভে যায়। পুরো ঘরটা অন্ধকার, শুধুমাত্র খোলা জানালা দিয়ে বাইরের একটু আলো ঘরের ভেতর এসে মনে হয় ঘরের ভেতরের অন্ধকারটা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঝুমু খালা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সাবধান। তেনারা কিন্তু ঘরের মাঝে ঢুকে গেছে।"

ছোটাচ্চু ভাঙা গলায় বলল, "কোন দিক দিয়ে ঢুকল?"

ছোটাচ্চুর প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই মনে হয় হঠাৎ করে জানালার একটা কপাট দড়াম করে নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। সবাই তখন একসাথে চিৎকার করে ওঠে। আর সাথে সাথে জানালার অন্য কপাটটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। সবাই তখন ভয়ে আবার চিৎকার করে ওঠে।

তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যেই মনে হয় জানালাটা বন্ধ হয়ে আবার হঠাৎ খুলে গেল। টুনি ঠিক তখন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে। ছোটাচ্চু আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, বলল, "কী হয়েছে টুনি? তুই উঠছিস কেন?"

"জানালাটা একটু দেখে আসি।"

ছোটাচ্চু চিৎকার করে বলল, "তোর সাহস বেশি হয়েছে? চুপ করে বসে থাক।"

ঝুমু খালা বলল, "হ্যাঁ টুনি। চুপচাপ বসে থাকো। তুমি বুঝতে পারছ না তেনারা এখন এই ঘরে আছেন? একটা গন্ধ পাচ্ছ না?"

সত্যি সত্যি ঘরের ভেতরে কোথা থেকে জানি একটা পোড়া মাংসের গন্ধ হাজির হয়েছে। তার সাথে ধূপের মতো একটা গন্ধ। ঝুমু খালা ফিসফিস করে বলল, "মড়া পোড়ার গন্ধ। শ্মশানে এরকম গন্ধ হয়। ইয়া মাবুদ! এখন কী হবে?"

ছোটাচ্চু তখন ভাঙা গলায় বলল, "আমার মনে হয় ভালো করে রিকোয়েস্ট করলে চলে যাবে!"

শান্ত জিজ্ঞেস করল, "কাকে রিকোয়েস্ট করলে?"

"যিনি ঘরে এসেছেন।"

শান্ত বলল, "তাহলে রিকোয়েস্ট করো। দেরি করছ কেন?"

ছোটাচ্চু কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, "হে বিদেহী আত্মা। আমরা না বুঝে আপনাদের আবাসস্থলে চলে এসেছি। আপনাদের শান্তিপূর্ণ জীবনে আমরা বিরক্তির সৃষ্টি করছি। সে জন্যে

আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং লজ্জিত। আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে আমরা আপনাদের এই আশ্রয়স্থল ছেড়ে চলে যাব। আপনারা আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের মার্জনা করুন। আমরা আর কখনোই আপনাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করব না। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের আর ভয়-ভীতি দেখাবেন না। আমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। আমাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করবেন না। প্লিজ।"

ছোটাচ্চু নিঃশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামল, ঠিক তখন সবাই একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেল। ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে, সেই কান্নার শব্দ বাইরে থেকে আসছে না, এই ঘরের ভেতর থেকে আসছে। মনে হচ্ছে ঘরের এক কোনায় একটি কমবয়সী মেয়ে বসে আকুল হয়ে কাঁদছে।

ঘরের সবাই পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল। কান্নার শব্দটা একটু থেমে যায় তারপর আবার শুরু হয়ে যায়। ইনিয়ে-বিনিয়ে করুণ একটা কান্না, সেটি শুনলে বুকের মাঝে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে। ছোটাচ্চু কাঁপা কাঁপা গলায় আবার তার করুণ আবেদন শুরু করল, "হে বিদেহিনী। হে মহাত্মন। হে অশরীরী আত্মা। আপনার কান্নার সুর আমাদের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। আমাদের বুককে ভেঙে দিচ্ছে। যখন আপনি বেঁচে ছিলেন তখন হয়তো আপনার একটি দুঃখময়-বেদনাময় জীবন ছিল, হয়তো পৃথিবীর নির্মম মানুষের কেউ আপনার জীবনকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আপনি হয়তো আমাদেরকে সেটি জানাতে চান। হে অশরীরী, হে বিদেহিনী..."

ছোটাচ্চু যখন করুণ স্বরে ভূতের কাছে তার আবেদন করে যাচ্ছে তখন টুনি টুম্পাকে ফিসফিস করে বলল, "টুম্পা, তোর ভয় লাগছে?"

টুম্পা ফিসফিস করে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"কতটুকু?"

"অনেক।"

"ভয় পাবি না। ভয়ের কিছু নাই।"

"কেন?"

"আমি এখন এই ভূতটাকে ধরব।"

"ধরবে!" টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "কীভাবে ধরবে?"

"প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে কোথা থেকে কান্নার শব্দ আসছে। আয় আমার সাথে।"

"আমার ভয় করছে টুনি আপু।"

"ভয়ের কিছু নাই। আয়।"

টুনি আর টুম্পা যখন কান্নার শব্দ কোথা থেকে আসছে দেখার জন্যে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে তখন ছোটাচ্চুর সাথে সাথে শান্তও ভূতের কাছে আবেদন করতে শুরু করেছে। সে অবশ্যি ছোটাচ্চুর মতো এত সুন্দর ভাষায় বলতে পারে না, তার কথাগুলো অনেক চাঁছাছোলা, কিন্তু ভূতের মনকে নরম করার জন্যে মনে হয় যথেষ্ট।

ঘরের কোনায় একটা বেসিন, টুনির মনে হলো এই বেসিনের কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে শব্দটা আসছে। বেসিনে কান পাততেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বেসিন থেকে পানি যাবার যে পাইপটা রয়েছে কান্নার শব্দটা সেখান থেকে আসছে। শুধু যে কান্নার শব্দ তা নয়, একটু আগে যে মাংস পোড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল সেটাও এখান থেকে আসছে। অর্থাৎ এই পাইপটা নিচে যেখানে গিয়েছে সেখানে কেউ একটু আগে মাংস পুড়িয়েছে, সাথে ধূপের গন্ধের জন্যে একটু ধূপও দিয়েছে। এখন ভয় দেখানোর জন্যে মুখ লাগিয়ে কান্নার শব্দ করছে। মানুষটি কে হতে পারে সেটাও মোটামুটি অনুমান করা যায়, নিশ্চয়ই রমজান আলীর লাজুক বউ। এমনিতে লাজুক কিন্তু রাতের বেলা ভয় দেখানোর সময় তার লাজুক ভাবটা কেটে যায়।

টুনি টুম্পাকে ফিসফিস করে বলল, "নিচে থেকে এই পাইপে মুখ লাগিয়ে কেউ একজন কান্নার শব্দ করছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি। শুনতে পাচ্ছিস না?"

"শুনতে পাচ্ছি।"

টুনি বলল, "এখন তাকে ধরব।"

"কীভাবে ধরবে টুনি আপু?"

"এক্ষুনি দেখবি।"

AMARBOI.COM

টুনি তখন অন্ধকারের মাঝেই হাতড়ে হাতড়ে একটা বোতল বের করল। টুম্পার হাতে দিয়ে বলল, "নে এটা ধর।"

টুম্পা সাধারণত টুনিকে কিছু জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু এবারে জিজ্ঞেস না করে পারল না, "এর ভিতরে কি টুনি আপু?"

"রং। হাজার পাওয়ার রং। যদি কারো গায়ে লাগায় সেটা পুরো এক সপ্তাহ থাকে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। টকটকে লাল।"

"কী করবে এটা দিয়ে?"

"এই পাইপ দিয়ে ঢালব, একটু একটু করে ঢাললে হবে না, একসাথে ঢালতে হবে। নিচে যেন হুড়হুড় করে একসাথে বের হয়। যে কান্নার শব্দ করছে তার মুখে যেন লাল রং লেগে যায়।"

"কীভাবে একসাথে ঢালবে?"

টুনি একটু চিন্তা করে বলল, "একটা মগ থাকলে হতো।"

"বাথরুমে মগ আছে।"

টুনি বলল, "তুই দাঁড়া আমি নিয়ে আসি।"

টুম্পা বলল, "না টুনি আপু। তুমি থাকো আমি নিয়ে আসি।"

"ভয় পাবি না তো?"

অন্ধকারে টুম্পা ফিক করে হাসল, বলল, "না টুনি আপু। এখন আর ভয় লাগছে না।"

ছোটাচ্চু আর শান্ত যখন করুণ গলায় তাদের ক্ষমা করার জন্যে প্রার্থনা করছে তখন টুম্পা অন্ধকারে পা টিপে টিপে বাথরুমে গিয়ে মগটা নিয়ে এলো। টুনি তখন সেই মগে হাজার পাওয়ারের সেই পাকা রংটা ঢেলে নিল। তারপর বেসিনের কাছে দাঁড়াল। যখন কান্নার শব্দটা খুব ভালোভাবে আসছে তখন টুনি হঠাৎ করে পুরো মগ ভর্তি রংটা ঢেলে দিল।

যতক্ষণ রংটা পাইপের ভেতর দিয়ে নিচে যাচ্ছিল ততক্ষণ কান্নার শব্দটা বন্ধ থাকল, কিন্তু নিচে হুড়হুড় করে বের হওয়ার পর আবার শব্দ শোনা গেল, তবে এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ। কোনো একজন নারী কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল, "হায় খোদা! এইটা কী? এইটা কী

AMARBOI.COM

হলো? কী বের হয় এখান থেকে? আমার মুখে কী লাগল?"

টুনি তখন তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ছয় ব্যাটারির একটা বিশাল টর্চ লাইট বের করে সেটা জ্বালিয়ে দিতেই ছোটাচ্চু আর শান্তর করুণ আবেদন থেমে গেল। ঝুমু খালা বলল, "টর্চ লাইট!"

টুনি বলল, "হ্যাঁ।"

ছোটাচ্চু বলল, "তোর কাছে এত পাওয়ারফুল একটা টর্চ লাইট আছে আর তুই আমাদের বলছিস না কেন? আমরা অন্ধকারে বসে আছি।"

"ছোটাচ্চু, যদি ভূত ধরতে চাও তাহলে আমার সাথে চলো।"

ছোটাচ্চু বলল, "কী বলছিস তুই পাগলের মতো?"

"ছোটাচ্চু, তুমি নিচে গেলেই দেখবে। আমি যাচ্ছি তোমরা চাইলে আসো।"

টুম্পা কম কথা বলে, উত্তেজনায় সে পর্যন্ত কথা বলে ফেলল, "হ্যাঁ, ছোটাচ্চু। ভূতের মুখে রং লাগানো হয়েছে, এখন খালি ধরতে হবে!"

"তোরা কী বলছিস আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"তোমাকে পরে বোঝাব। আমাদের হাতে সময় নাই। আমরা গেলাম। ঝুমু খালা তুমি যাবে?"

ঝুমু খালার সাহস ফিরে এলো, বলল, "একশ'বার যাব। ভূতের বাচ্চা ভূত, বান্দীর বাচ্চা বান্দী কে যদি আমি কিলিয়ে ভর্তা না বানাই।"

টুনি বলল, "তুমি শান্ত ভাইয়ার ব্যাটটা নিয়ে নাও। হাতে একটা অস্ত্র থাকা ভালো।"

যখন ছোটাচ্চু আর শান্ত দেখল সত্যি সত্যি অন্য সবাই ভূত ধরতে যাচ্ছে তখন তারাও পিছু পিছু নেমে এলো। দরজা খুলে বের হয়ে বিশাল টর্চ লাইটটা নিয়ে সবার আগে টুনি তার পিছনে টুম্পা তারপর ঝুমু খালা আর সবার পিছনে শান্ত আর ছোটাচ্চু প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে রমজান আলীর বাসার দিকে ছুটতে থাকে।

বাসাটা অন্ধকার, দেখে মনে হয় সবাই ঘুমিয়ে আছে। টুনি জানে সবাই এখন এখানেই আছে এবং খুব ভালোভাবেই জেগে আছে। টুনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "রমজান চাচা, দরজা খুলেন। তাড়াতাড়ি।"

ভেতরে কোনো শব্দ নাই। টুনি তখন আরো জোরে জোরে দরজা ধাক্কা দিল, বলল, "দরজা খুলেন।"

AMARBOI.COM

এবারেও কেউ দরজা খুলল না। ঝুমু খালা তখন হুংকার দিয়ে বলল, "দরজা খুলেন, তা না হলে কিন্তু খবর আছে।"

টুনি বলল, "পুলিশে খবর দিলে কিন্তু আপনার বিপদ আছে।"

ঝুমু খালা বলল, "বিপদ মানে মহাবিপদ। বাঘে ছুঁলে হয় আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।"

এবারে মনে হলো ভিতরে একটু খুটখাট শব্দ, একটু ফিসফিস কথাবার্তা শোনা গেল। টুনি বলল, শুনেন, "আমরা সবকিছু জানি। মেইন সুইচে আমি হাজার পাওয়ার রঙের গুঁড়া লাগিয়ে এসেছি, আপনারা যখন সেটা অফ করেছেন তখন হাতে রং লেগেছে, যতই ধোয়ার চেষ্টা করেন সেই রং আর উঠবে না!"

ঝুমু খালা বলল, "হুঁ হুঁ! মজাটা টের পাবে তখন।"

শান্ত তার ব্যাটটা দিয়ে মাটিতে দুই-চারবার ঘা দিল।

টুনি বলল, "দরজাটা খুলেন। আমরা আপনাদের কিছু বলব না, শুধু একনজর দেখতে চাই। উপর থেকে আমি বেসিনে লাল রং ঢেলে দিয়েছি, আপনাদের যিনি পাইপে মুখ লাগিয়ে কাঁদছিলেন তার মুখে লাল রং লেগে গেছে। আমরা জানি, যতই সাবান দিয়ে ধোয়ার চেষ্টা করেন এই রং আর উঠবে না!"

ঝুমু খালা বলল, "উঠবে না। সোডা দিয়ে সিদ্ধ করলেও উঠবে না।"

টুনি বলতেই থাকল, "কাপড় শুকানোর দড়ি টেনে কীভাবে গাছের ডাল নাড়িয়েছেন সেটাও আমরা জানি। জানালার কপাটে দড়ি লাগিয়ে কীভাবে নিচে থেকে এটা খুলেছেন আর বন্ধ করেছেন সেইটাও আমরা জানি। কাজ শেষ করে আপনারা দড়িটা টেনে সরাতে পারেন নাই, তার কারণ দড়িটা আমি ওপরে পেঁচিয়ে রেখেছি।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে টুনির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঝুমু খালা দরজায় লাথি দিয়ে বলল, "এখন দরজা খুলেন। এই দড়ি আপনাদের কোমরে বেঁধে থানায় নিয়ে যাব। পাইছেনটা কী?"

টুনি বলল, "শুধু শুধু ঘরের ভেতরে থেকে লাভ নাই, বের হয়ে আসেন। মনে করবেন না আমরা কিছু বুঝি না। আমরা সব বুঝি। মোমবাতিটা এখনো পরীক্ষা করি নাই, কিন্তু পরীক্ষা না করেই বলতে পারি মোমবাতির সুতাটা কেটে ছোট করে রেখেছেন, যেন একটুক্ষণ পরেই নিভে যায়!"

AMARBOI.COM

ঝুমু খালা হুংকার দিল, "আপনারা কি আমাদের বেকুব ভাবছেন? আপনাদের বুদ্ধি যদি থাকে মাথার ভিতরে আমাদের বুদ্ধি তখন থাকে রগে রগে।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমরা দশ পর্যন্ত গুনব, এর মাঝে দরজা না খুললে পুলিশে ফোন করে দিব।"

ঝুমু খালা বলল, "শুধু পুলিশ না, মিলিটারি বিজিবি র‍্যাব সবাইরে ফোন করে দিব। আপনাদের ধরে নিয়ে সাথে সাথে ক্রস ফায়ার!"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি গুনতে শুরু করলাম, এক।"

কয়েক সেকেন্ড পর টুনি বলল, "দুই।"

ঝুমু খালা হুংকার দিল, "তিন।"

টুম্পা আস্তে আস্তে বলল, "চার।"

শান্ত গর্জন করল, "পাঁচ।"

'ছয়' বলার আগেই খুট করে দরজা খুলে গেল। সবার সামনে ফুটফুটে একটা বউ, সারা মুখে লাল রং। দুই হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু ঢাকতে পারছে না। তার পিছনে রমজান আলী, হাতটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ডান হাতের আঙুলগুলো টকটকে লাল। তাদের পিছনে বিশ-বাইশ বছরের একটা ছেলে, গায়ে কালো টি-শার্ট, শুধু তার শরীরের কোথাও কোনো রং নেই। তিনজন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল আর ছোটাচ্চু কোমরে হাত দিয়ে হুংকার দিয়ে বলল, "আপনাদের এত বড় সাহস। আমাদের ভূতের ভয় দেখান—আপনাদের আমি পুলিশে দেব।"

রমজান আলী মাথা নিচু করে বলল, "ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দেন।"

"মাফ? মাফ করা এত সোজা? এক্ষুনি আমি পুলিশকে ফোন করব—"

টুনি ছোটাচ্চুর শার্টটা টেনে বলল, "ছোটাচ্চু, মনে আছে, নানির রাজাকার টাইপ ভাইটা যখন আমাদের বাসায় এসেছিল তখন তুমি আমাদেরকে নিয়ে তাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"সেই বুড়ো রাজাকার ভয়ে কাপড়ে বাথরুম করে দিয়েছিল মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"তখন তোমাকে তো আমরা পুলিশে দেই নাই। দিয়েছিলাম?

"কিন্তু—"

"তাই এদেরকেও তুমি পুলিশে দিতে পারবে না।"

টুম্পা এবং শান্ত টুনির কথার সাথে সাথে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "পারবে না। কিছুতেই পারবে না। নিয়ম নাই।"

"তাহলে তোরা বলতে চাস এদের কোনো শাস্তি হবে না?"

টুনি বলল, "অপরাধ করলে শাস্তি হয়। মজা করলে শাস্তি হয় না।"

টুম্পা আর শান্ত মাথা নাড়ল, "হয় না। মজা করলে শাস্তি হয় না। সবাই মজা করতে পারে।"

টুনি বলল, "আর তুমি যদি মনে করো একটা শাস্তি দিতেই হবে তাহলে একটা শাস্তি দেওয়া যায়।"

ছোটাচ্চু গম্ভীর গলায় বলল, "কী শাস্তি?"

"যা খিদে পেয়েছে। রমজান চাচি যদি কোনো একটা নাস্তা বানিয়ে খাওয়ায়—সাথে পায়েসের মতো ঐ মসলা চা!"

শান্ত জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "গুড আইডিয়া। আমারও খুব খিদে লেগেছে। ভয় পেলে মনে হয় বেশি খিদে লাগে।"

"এই শাস্তি?"

টুনি, টুম্পা আর শান্ত বলল, "হ্যাঁ।"

ফুটফুটে বউটা এই প্রথম মুখ ফুটে কথা বলল, "লুচি ভেজে দেই? সাথে বেগুন ভাজি আর ডিম ভুনা? রসমালাই আছে একটু, দিব?"

কেউ কিছু বলার আগে শান্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া।"

ঝুমু খালা বউটিকে বলল, "আমি যখনই লুচি ভাজি কেমন জানি কড়কড়া হয়ে যায়, নরম হয় না। তুমি আমাকে শিখাবা কেমন করে নরম লুচি ভাজতে হয়?"

বউটি ফিক করে একটু হেসে বলল, "আসেন।"

ছোটাচ্চু, টুনি, টুম্পা আর শান্ত যখন রমজান আলীর বাড়ি থেকে বাগানবাড়িতে ফিরে যাচ্ছে তখন ছোটাচ্চু বিড়বিড় করে বলল, "সবকিছু বুঝলাম। একটা জিনিস শুধু বুঝতে পারলাম না।"

AMARBOI.COM

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝতে পারলে না?"
"কেন এরা সবাইকে ভূতের ভয় দেখায়?"

মিনিট ত্রিশেক পর যখন লুচি, বেগুন ভাজা, ডিম ভুনা, রসমালাই আর পায়েসের মতো মসলা চা সবাই মিলে খাচ্ছে তখন একটু একটু করে সবাইকে ভূতের ভয় দেখানোর কারণটা জানা গেল। রমজান আলী আর তার বউয়ের এই বাগানবাড়ি ছাড়া থাকার কোনো জায়গা নেই। খবর পেয়েছে মালিক এটা বিক্রি করার চিন্তা করছে, তাই তারা ভেবেছে যদি এই বাগানবাড়িটাকে ভূতের বাড়ি হিসেবে দাঁড়া করানো যায় তাহলে হয়তো আর কেউ কিনতে রাজি হবে না! সে জন্যে যখনই কেউ আসে তারা একবার ভূতের ভয় দেখিয়ে দেয়।

ফিরে গিয়ে ছোটাচ্চু তার ক্লায়েন্টকে রিপোর্ট দিল যে, এই বাগানবাড়িতে কোনো ভূত নেই, তবে বাড়িটা এমন একটা পরিবেশে আছে যে এটাকে ভূতের বাড়ি হিসেবে পরিচয় দিয়ে উৎসাহী দর্শকদের ভূত দেখার অভিজ্ঞতার জন্যে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে! কেউ যেন নিরাশ না হয় খুব সহজেই ভূত দেখানোর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। আইডিয়াটা বাড়ির মালিকের বেশ পছন্দ হয়েছে, কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে ছোটাচ্চুর সাথে আলোচনা করেছে, ছোটাচ্চুর ধারণা রমজান আলী, তার বউ আর শালার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।

ভূতের বাড়ি দেখতে যাওয়া নিয়ে আর কারো কোনো লাভ হয়েছে কি না কেউ জানে না, শুধু টুনির বিশাল লাভ হয়েছে। ছোটাচ্চু যখনই কোনো কিছু নিয়ে গড়িমসি করে তখন টুনি বলে, "ছোটাচ্চু দেব সবাইকে বলে? তুমি কীভাবে তোমার তাবিজটা ধরে বলেছিলে, হে বিদেহী আত্মা হে অশরীরী..."

ছোটাচ্চু তখন লাফ দিয়ে এসে টুনির মুখ চেপে ধরে বলে, "বলিস না, বলিস না প্লিজ! তোর কসম লাগে। তুই কী চাস বল!"

টুনির দিনকাল এখন ভালোই যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু বসার ঘরে ঢুকে ডান হাতটা উপরে তুলে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "প্রজেক্ট ডাইনি বুড়ি।"

বাচ্চারা মেঝেতে বসে রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা খেলছিল, তারা খেলা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে ছোটাচ্চুর কথা শুনতে পেল না। খেলাটার আসল নাম ছিল চোর-পুলিশ, বাসার সবচেয়ে ছোট বাচ্চা গুড্ডু চোর-পুলিশ ছাড়া আর কিছু খেলতে পারে না, তাই সে সবসময় চোর-পুলিশ লেখা কয়েকটা কাগজ নিয়ে সবার পিছনে পিছনে এটা খেলার জন্যে ঘুরে বেড়াত, কেউ খেলতে রাজি হতো না। তখন টুনি তাকে বুদ্ধি দিয়ে বলল, "তোর এই খেলা কেউ খেলবে না, স্মার্ট ফোনে কত হাইফাই খেলা আছে দেখেছিস? তুই এই চোর-পুলিশ খেলাটাকে বদলে ফেল। চোর আর ডাকাতের বদলে নাম দে রাজাকার আর আলবদর। পুলিশ আর দারোগার বদলে নাম দে মুক্তিযোদ্ধা আর সেক্টর কমান্ডার। তাহলে দেখবি সবাই খেলবে।"

টুনির বুদ্ধি শুনে গুড্ডু খেলার চরিত্রগুলোর নাম পাল্টে দিল, তখন সত্যি সত্যি সবাই এটা খেলতে লাগল। প্রথমে চারজন খেলত, খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়তে থাকলে মুক্তিযোদ্ধাও বাড়াতে হলো, ছেলে মুক্তিযোদ্ধা, মেয়ে মুক্তিযোদ্ধা, শিশু মুক্তিযোদ্ধা, কিশোর মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হলো। খেলোয়াড় আরো বেড়ে যাবার পর রাজাকার-আলবদরের সাথে সাথে আলশামস, শান্তি বাহিনী, পাকিস্তানি মিলিটারি এই চরিত্রগুলো তৈরি করতে হলো। খেলার মাঝে সেক্টর কমান্ডার যখন মুক্তিযোদ্ধাদের রাজাকার, আলবদর, শান্তিবাহিনী কিংবা পাকিস্তান মিলিটারি ধরে আনতে বলে তখন তারা শুধু ধরে আনে না, ধরার পর রীতিমতো ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেয়! কাউকে ধোলাই দিলে সেটা এমনি এমনি কেউ সহ্য করত না, কিন্তু রাজাকার

AMARBOI.COM

হিসেবে ধোলাই খেয়ে তারা গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে কিন্তু কিছু মনে করে না। ধরেই নিয়েছে রাজাকার-আলবদর হলে একটু পিটুনি খেতেই হবে! কাজেই অত্যন্ত নিরীহ চোর-পুলিশ খেলাটা এখন প্রচণ্ড নাটকীয় এবং ভয়ঙ্কর উত্তেজনার একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চারা যখন এই খেলাটি খেলে তখন তাদের ধারে-কাছে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে না। তাই বাচ্চারা কেউ যে ছোটাচ্চুর ঘোষণাটা শুনতে পায়নি তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ছোটাচ্চু তখন গলা আরো উঁচিয়ে বলল, "প্রজেক্ট ডাইনি বুড়ি।"

এবারে বাচ্চারা মাথা ঘুরিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল। শান্ত এবারে রাজাকার হিসেবে ধরা পড়ে বেদম মার খাচ্ছিল, সবাই আপাতত মার থামিয়ে ছোটাচ্চুর কথা শোনার চেষ্টা করল। একজন জিজ্ঞেস করল, "প্রজেক্ট কী বুড়ি?"

ছোটাচ্চু মুখ গম্ভীর করে বলল, "ডাইনি বুড়ি।"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "ডাইনি বুড়ি? সত্যি?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল বলল, "হ্যাঁ।"

"নাকের মাঝে আঁচল আছে? ঝাড়ুর মাঝে বাস, আকাশে উড়তে পারে।"

ছোটাচ্চু বলল, "ওইগুলো আমেরিকান ডাইনি বুড়ি। আমাদের বাংলাদেশের ডাইনি বুড়ি আকাশে ওড়ে না।"

তখন আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "বাংলাদেশের ডাইনি বুড়িরা কী করে?"

"ছেলে-মেয়েদের যন্ত্রণা দেয়। তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে দেয়।"

তখন একজন এদিক-সেদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমার আম্মুও তো আমাকে যন্ত্রণা দেয়, তাহলে আম্মু কি ডাইনি বুড়ি?"

ছোটাচ্চু বলল, "আরে ধুর! এই যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণা না।"

"তাহলে কী রকম যন্ত্রণা।"

"মনে কর কোনো একটা বুড়ি নিজের ছেলে-মেয়েকে ভালোবাসে না, আদর করে না, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অন্যদের জন্যে দরদে বুক ভাসিয়ে দেয়।"

AMARBOI.COM

বাচ্চাদের আশা ভঙ্গ হলো। তারা ভেবেছিল ছোটাচ্চু আরো ভয়ঙ্কর কিছু বলবে, রাত্রি বেলা মানুষের ঘাড়ে কামড় দিয়ে রক্ত শুষে খায়, এরকম কিছু। ছেলে-মেয়েকে ভালোবাসে না, আদর করে না এটা আবার কী রকম ডাইনি বুড়ি? খুবই পানসে ম্যাড়ম্যাড়া ডাইনি বুড়ি।

বাচ্চারা আবার তাদের রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা খেলায় ফিরে গেল। এই রকম ডাইনি বুড়িতে তাদের খুব বেশি উৎসাহ নেই। ছোটাচ্চুর অবশ্যি অনেক উৎসাহ, বাচ্চাদের ডেকে বলল, "আমার এই প্রজেক্টের জন্যে এডভান্স টাকা দিয়েছে সেটা জানিস?"

সবাই প্রায় একসাথে জিজ্ঞেস করল, "কত টাকা?"

ছোটাচ্চু মনে হলো এই প্রশ্নটা শুনে একটু বিরক্ত হলো, মুখ ভোঁতা করে বলল, "কত টাকা সেটা ইম্পরট্যান্ট না। ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে পার্টি এখন আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এডভান্স টাকা দেয়। সেটাই হচ্ছে ইম্পরট্যান্ট।"

শান্ত রাজি হলো না, "মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। কত টাকা দিয়েছে সেইটা ইম্পরট্যান্ট।"

ছোটাচ্চু আরো বিরক্ত হয়ে বলল, "সেটা মোটেও ইম্পরট্যান্ট না।"

শান্ত বলল, "বুঝেছি। তোমাকে আসলে খুবই কম টাকা দিয়েছে সেই জন্যে আমাদের বলতে চাইছ না।"

ছোটাচ্চু ধমক দিয়ে বলল, "সবসময় শুধু টাকা টাকা করবি না।"

শান্ত বলল, "ঠিক আছে। এখন থেকে ডলারে কথা বলব। তোমাকে কত ডলার দিয়েছে ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু একটা বাজখাঁই ধমক দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই টুনি জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রজেক্টটা কী ছোটাচ্চু?"

সবচেয়ে শান্তশিষ্ট মেয়েটি বলল, "ডাইনি বুড়িকে মার্ডার করতে হবে মনে হয়। কেমন করে মার্ডার করবে ছোটাচ্চু?"

আরেকজন উৎসাহ নিয়ে বলল, "রিভলবার দিয়ে গুলি করবে, তাই না ছোটাচ্চু?"

আরেকজন আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে বলল, "না-না-না। ডাইনি বুড়িদের গুলি করলে কিছু হয় না। তাদের গলা টিপে মারতে হয়। তুমি গলা টিপে মারবে, তাই না ছোটাচ্চু?"

AMARBOI.COM

একজন সাবধান করে দিল, "তুমি কিন্তু খুব সাবধান থেকো। ডাইনি বুড়ি ইচ্ছা করলেই মন্ত্র দিয়ে তোমাকে ভেড়া বানিয়ে দেবে।"

আরেকজন সেটা ব্যাখ্যা করল, "তারপর কচ করে তোমার মাথাটা কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলবে। তোমার কোনো মাথাই থাকবে না।"

শান্ত বলল, "তুমি নিজে নিজে ডাইনি বুড়িকে মার্ডার করতে যেয়ো না। পুলিশ-র‍্যাব তোমাকে ধরে ফেলবে। একটা হিটম্যান ভাড়া করো। আজকাল রেট অনেক কম। দুই হাজার টাকা দিলে যে কাউকে মার্ডার করে দিবে।"

ছোটাচ্চু বাচ্চাদের কথা শুনে খুবই বিরক্ত হলো। বলল, "তোরা এমন ভায়োলেন্ট হলি কেমন করে? ছোট ছোট বাচ্চারা কত সুইট হয়, কত সুন্দর করে কথা বলে, আর তোরা শুধু মার্ডার নিয়ে কথা বলিস। খুন-জখম নিয়ে কথা বলিস। তোদের সমস্যাটা কী?"

একজন বলল, "আমরা খুন-জখম নিয়ে কথা বলি তোমার জন্যে। তুমি খুন-জখম-মার্ডার করো সেই জন্যে আমরা খুন-জখম-মার্ডার নিয়ে কথা বলি।"

ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "আমি কোনোদিন খুন, জখম, মার্ডার করেছি?"

"আমরা বইয়ে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। ডিটেকটিভরা সব সময় খুন-জখম-মার্ডার করে। তুমিও করবে। তাই না রে?"

সব বাচ্চা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। ছোটাচ্চুও খুন-জখম-মার্ডার করবে।"

ছোটাচ্চু গলা উঁচিয়ে বলল, "কোনোদিনও আমি খুন-জখম-মার্ডার করব না। গল্প বইয়ের ডিটেকটিভ আর বাস্তবের ডিটেকটিভ এক না। বাস্তবের ডিটেকটিভের কাজ হচ্ছে বুদ্ধির কাজ। মগজের কাজ।"

ছোট একজন বলল, "কিন্তু তোমার তো মগজও কম। বুদ্ধিও কম।"

ছোটাচ্চু চোখ লাল করে বলল, "কে বলেছে?"

"সবাই বলে।"

ছোটাচ্চু রেগে কী একটা বলতে যাচ্ছিল টুনি থামিয়ে দিয়ে বলল, "ছোটাচ্চু তুমি এখনো বলো নাই, ডাইনি বুড়ি নিয়ে তোমার কাজটা কী?"

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু গজগজ করে বলল, "আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম, তোদের যন্ত্রণায় কি কথা বলা যায়?"

"ঠিক আছে। এখন বলো।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি যে ডাইনি বুড়ির কথা বলছি তার ছয় ছেলে-মেয়ে। দুইজন থাকে আমেরিকা, একজন থাকে দুবাই, বাকি তিনজন দেশে থাকে। এখন ছুটিতে সবাই দেশে এসেছে, এসে পড়েছে মহা মুশকিলে।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী মুশকিল?"

"ডাইনি বুড়ির হাজব্যান্ড যখন বেঁচে ছিল তখন নাকি ডাইনি বুড়ি ভালোই ছিল, ছেলে-মেয়েদের আদর করত। এখন ছেলে-মেয়েদের দুই চোখে দেখতে পারে না। দেখা হলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"সেটাই তো কেউ জানে না। ছেলে-মেয়ের ধারণা তার মায়ের একটু মাথা খারাপের মতো হয়েছে।"

"কেন? কী করে?"

"যেমন মনে কর, তার যা কিছু আছে সেগুলো এখানে-সেখানে ফেলে দেয়। নষ্ট করে ফেলে!"

"আর কী করে?"

"তার হাজব্যান্ড এই ডাইনি বুড়ির নামে জমি লিখে দিয়েছিল, ডাইনি বুড়ি এখন এই জমিটা নাকি নষ্ট করবে!"

শান্ত ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "জমি কীভাবে নষ্ট করে?"

ছোট একজন বলল, "ফ্রিজের বাইরে গোশত রাখলে গোশত নষ্ট হয়ে যায় না? মনে হয় সেইরকম, তাই না ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু বলল, "ধুর গাধা! জমি কি কেউ ফ্রিজে রাখে নাকি? জমি নষ্ট করা মানে হচ্ছে জমিটা পাগল-ছাগলকে দান করে দেওয়া। অপদার্থ মানুষদের দিয়ে দেওয়া। ক্রিমিনালদের দিয়ে দেওয়া।"

বাচ্চারা কেউ কিছু বুঝতে পারল না কিন্তু তারা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। জমি কাউকে দিয়ে দিলে দিবে, না দিলে দিবে না। এটা নিশ্চয়ই ভেজাল ডাইনি বুড়ি। সত্যিকারের ডাইনি বুড়ি নিশ্চয়ই জমি নষ্ট করে না। তারা ছোট বাচ্চাদের ধরে ধরে কচমচ করে খায়! সেই রকম ডাইনি বুড়ি হলে একটা কথা ছিল। একটা ভেজাল ডাইনি বুড়ি

AMARBOI.COM

যে তার জমি ছেলেমেয়েদের না দিয়ে আলতু-ফালতু মানুষদের দিয়ে দিচ্ছে তাকে নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নাই। বাচ্চারা আবার তাদের রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা খেলায় ফিরে গেল।

রাত্রিবেলা টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে হাজির হলো। ছোটাচ্চু তার বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে, কোলে একটা খাতা এবং হাতে একটা বল পয়েন্ট কলম, কলমটা গভীর মনোযোগ দিয়ে চিবুচ্ছে। টুনি ডাকল, "ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু বলল, "উঁ।"

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু আমি তোমার ডাইনি বুড়ির কেসের একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।"

"কী জিনিস?"

"তোমাকে কী করতে হবে?"

"আমাকে ডাইনি বুড়ির কাছ থেকে জমির দলিলটা উদ্ধার করে দিতে হবে।"

টুনি বলল, "ও।" যদিও সে কিছুই বুঝতে পারল না।

ছোটাচ্চু বলল, "ডাইনি বুড়ি জমির দলিলটা তার ঘরে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। পুরো ঘরটা আঁতিপাঁতি করে সবাই মিলে খুঁজেছে কিন্তু কেউ খুঁজে পায় নাই। আমাকে সেটা খুঁজে বের করে দিতে হবে।"

টুনি আবার বলল, "ও।"

ছোটাচ্চু বলল, "দলিলটা খুঁজে পেলে জমিটা উদ্ধার করা যাবে। তা না হলে ডাইনি বুড়ি যাকে জমিটা দিয়েছে সে যদি মামলা করে দেয় তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। এখনো তো নামজারি হয় নাই, তাই একটা সুযোগ আছে। জমি যখন বিক্রি হয় তখন প্রথমে জমি রেজিস্ট্রি করতে হয়। তারপর..." ছোটাচ্চু তখন কেমন করে জমি বিক্রি করতে হয় তার নিয়ম-কানুনগুলো টুনিকে খুব উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে লাগল, টুনি কিছুই বুঝতে পারল না। ছোটাচ্চু অনেকক্ষণ কথা বলে শেষ পর্যন্ত কেমন জানি ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল। টুনি আবার জমি বিক্রি নিয়ে নতুন আরেকটা বক্তৃতা না শুরু করে দেয় সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চেষ্টা করল, দরজার কাছাকাছি গিয়ে থেমে গিয়ে

AMARBOI.COM

আবার ফিরে এসে ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ছোটাচ্চু, তুমি কি ডাইনি বুড়িকে দেখেছ?"

ছোটাচ্চু বলল, "না, এখনো দেখি নাই।"

"তাহলে তুমি কেমন করে জানো বুড়িটা ডাইনি বুড়ি?"

ছোটাচ্চু সোজা হয়ে বলল, "আমি কি শুধু শুধু একটা বুড়িকে ডাইনি বুড়ি বলব? তার ছেলে-মেয়েরা বলেছে বলেই তো আমি বলি।"

টুনি তার বড় বড় চশমার ফাঁক দিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ছেলে-মেয়েরা তার নিজের মা'কে ডাইনি বুড়ি ডাকে?"

"হ্যাঁ।"

টুনি কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আচ্ছা ছোটাচ্চু, এমন কি হতে পারে যে মা'টা ঠিকই আছে, ছেলে-মেয়েগুলো ডাইনি বুড়া আর ডাইনি বুড়ি?"

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ডাইনি বুড়া আর ডাইনি বুড়ি?"

"হ্যাঁ, মেয়েরা যদি ডাইনি বুড়ি হতে পারে তাহলে ছেলেরা কেন ডাইনি বুড়া হতে পারবে না?"

ছোটাচ্চু কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, তারপর বলল, "ডাইনি বুড়া? তুই বলছিস মেয়েরা যদি ডাইনি বুড়ি হয় তাহলে ছেলেরা হবে ডাইনি বুড়া?

"হ্যাঁ। যদি বয়স কম হয়, বুড়া-বুড়ি বলতে না চাও তাহলে বলতে পারো বেটা-বেটি। ডাইনি বেটা ডাইনি বেটি।"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকাতে লাগল, তারপর নিজেও একটা বিশাল নিঃশ্বাস ফেলল। টুনি তখন ছোটাচ্চুকে আরো ভালো করে মাথা চুলকানোর সুযোগ করে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। পরদিন ছোটাচ্চু যখন তার ঘর থেকে বের হচ্ছে ঠিক তখন টুনি সেখানে হাজির হলো। সেও বের হবার জন্যে সেজেগুঁজে ফিটফাট হয়ে এসেছে।

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"তোমার সাথে।"

ছোটাচ্চু আরো অবাক হয়ে বলল, "আমার সাথে?"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ। ডাইনি বুড়ি দেখতে।"

"ডা-ডাইনি বুড়ি দেখতে?"

"হ্যাঁ। তুমি এখন ডাইনি বুড়ির বাড়িতে যাচ্ছ না?"

ছোটাচ্চু আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু তুই কেমন করে জানিস?"

ছোটাচ্চুর টেলিফোনে কথাবার্তা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই যে এগুলো জানা যায় টুনি সেটা আর বলল না। মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি ডিটেকটিভ। আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট মনে নাই? আমি সব জানি।"

ছোটাচ্চু বলল, "কিন্তু আমি এখন যাচ্ছি ফ্যামিলির সবার সাথে কথা বলতে, তুই বাচ্চা মানুষ গিয়ে কী করবি?"

"আমি কিছু করব না। শুধু ডাইনি বুড়িকে একনজর দেখব। আমি জীবনে ডাইনি বুড়ি দেখি নাই।"

"কিন্তু—"

"ছোটাচ্চু, তোমার কোনো কাজে আমি কোনোদিন ঝামেলা করেছি? করি নাই। বরং উল্টোটা হয়েছে—আমি তোমার কেস সলভ করে দিয়েছি।"

"কিন্তু—"

"আমি তোমাদের কোনো ঝামেলা করব না। তুমি ফ্যামিলির সাথে কথা বলবে, আমি তখন ডাইনি বুড়িকে একটু দেখে আসব। যদি ডাইনি বুড়ি কথা বলতে রাজি হয় তাহলে তার কথা শুনতে পারি। তার ঘরটা একটু দেখে আসতে পারি, তোমার কাজে লাগবে। মনে নাই—"

ছোটাচ্চু বলল, "কিন্তু—"

টুনি বলল, "কোনো কিন্তু নাই ছোটাচ্চু। মনে নাই ভূতের বাড়িতে তুমি গলায় তাবিজ লাগিয়ে বিদেহী আত্মার কাছে কত কী বলেছিলে? আমাকে তুমি বলেছ সেই কথাটা যেন আমি কাউকে না বলি। আমি তোমার কথা শুনেছি। কাউকে বলি নাই। আর তুমি আমার এই ছোট একটা কথা শুনতে পারবে না?"

ছোটাচ্চুর মুখটা এবারে একটু আমসি মেরে গেল। এই মেয়েটি বাকি জীবন ভূতের বাড়ির সেই ঘটনাটা দিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল

AMARBOI.COM

করবে। যদি কোনোদিন ফারিহাকে বলে দেয় তাহলে বেইজ্জতির চূড়ান্ত হবে। ছোটাচ্চু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মিনমিন করে বলল, "ঠিক আছে চল।"

টুনি ছোটাচ্চুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি এত সুইট ছোটাচ্চু! এই জন্যেই তো আমরা তোমাকে এত পছন্দ করি।"

ডাইনি বুড়ির বাসায় ডাইনি বুড়ির ছেলে-মেয়েরা ছোটাচ্চুর সাথে টুনিকে দেখে বেশ অবাক এবং মনে হলো একটু বিরক্ত হলো। ছোটাচ্চু অবশ্যি খুব কায়দা করে ব্যাপারটা সামলে নিল। তাদেরকে বোঝাল এরকম কেসে সে ইচ্ছে করে টুনিকে নিয়ে যায়, বয়স্ক মানুষেরা বড় মানুষের কাছে মুখ খুলে না কিন্তু ছোট বাচ্চাদের সাথে একেবারে খোলামেলা কথা বলে ফেলে। টুনিকে পাঠানো হচ্ছে ডাইনি বুড়ির ভেতরের খবর বের করার জন্যে। ডাইনি বুড়ির ছেলে-মেয়েরা ছোটাচ্চুর কথা বিশ্বাস করে টুনিকে ডাইনি বুড়ির ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলার জন্যে বাইরের ঘরে বসল। ডাইনি বুড়ির ছয় ছেলে-মেয়ে তাকে ঘিরে সোফায় বসে পড়ে। বড় ছেলের মাথায় টাক কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় সেটা সে জানে না। একটু পরে পরে হাত দিয়ে সে তার মাথার অদৃশ্য চুলে হাত বুলায়। সে-ই কথা শুরু করল, অনেক দিন থেকে সে আমেরিকায় আছে, তাই বাংলা কথা তার মুখে আসতেই চায় না। ইংরেজিটা খাঁটি আমেরিকান উচ্চারণ, বাংলাটাও ইংরেজির মতো শোনায়। সে ছোটাচ্চুকে বলল, "আপনি বুঝেছেন আপনাকে কী করতে হবে?"

"করতে হবে" শব্দ দুটো অবশ্যি শোনা গেল "কড়টে হবে" তবে ছোটাচ্চু সেজন্যে কিছু মনে করল না। একজন মানুষকে সারা জীবন দেশের বাইরে থাকতে হলে এরকম কিছু একটা হতেই পারে। ছোটাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে কী করতে হবে। একটা জমির দলিল আপনার মা তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন, সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

বড় ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "ইয়েস।"

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু বলল, "এটা কীসের দলিল, কেন আপনার মা সেটা আপনাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চান, কেন আপনারা তার পরও সেটা খুঁজে বের করতে চান সেটা কি আমাকে একটু বলবেন?"

বড় ভাই বলার চেষ্টা করল, ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে কিছু একটা বলতে শুরু করল, তখন বড় বোন তাকে ঝটকা মেরে থামিয়ে দিল। বড় বোন মোটাসোটা এবং নাদুসনুদুস। দেখে মনে হয় নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে, সব সময়ই কেমন যেন হাঁসফাঁস করতে থাকে। হাঁসফাঁস করতে করতে বলল, "আমার মা এইরকম করছেন তার একটাই কারণ! তার কারণ আমার মা আসলে একটা ডাইনি বুড়ি! সবার মা থাকে, তারা তাদের বাচ্চাদের কত আদর করে আর আমার মা আমাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়—" বড় বোন কথা শেষ না করে হেঁচকির মতো শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল।

ছোটাচ্চু খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, ছোট বাচ্চারা কাঁদলে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। কিন্তু বড় মানুষ বিশেষ করে মোটাসোটা নাদুসনুদুস মানুষ হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলে তাকে কীভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায় ছোটাচ্চু বুঝতে পারল না। কাঠির মতো শুকনো ছোট একজন বোন তাকে সান্ত্বনা দিল, বলল, "তুমি খামোখা কাঁদছ কেন বড় আপু? বুড়ির কাছে তোমার চোখের পানির কোনো দাম আছে?"

বড় বোন তখন হেঁচকি তোলা থামিয়ে কান্না বন্ধ করল। বড় ভাই তখন ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কীভাবে কাজ শুরু করবেন?" (বড় ভাই অবশ্যি 'শুরু করবেন' বলল না, বলল 'শুড়ু কড়বেন')।

ছোটাচ্চু গম্ভীর গলায় বলল, "আপনারা নিজেরা যেহেতু অনেক খুঁজেও দলিলটা পাননি, কাজেই ধরে নিচ্ছি আপনার মা সেটা বেশ ভালোভাবেই লুকিয়ে রেখেছেন, কাজেই সাধারণভাবে খুঁজে এটা পাওয়া যাবে না। তারপরেও আমি সাধারণভাবে একবার খুঁজে দেখতে চাই। কিন্তু ঘরে আপনার মা থাকলে সেটা সম্ভব হবে না।"

নাদুসনুদুস বড় বোন হাঁসফাঁস করতে করতে বলল, "সেটা কোনো সমস্যা না। বুড়ি বই পড়তে খুব পছন্দ করে, তাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেই সে বই কিনতে চলে যায়।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "ঘরে তালা দিয়ে যান?"

কাঠির মতো শুকনো লিকলিকে বোন বলল, "তাতে সমস্যা নাই। আমরা তালা-চাবিওয়ালা ডেকে তালার চাবি বানিয়ে রেখেছি। বুড়ি বাইরে গেলেই ঘরে ঢুকি।"

ছোটাচ্চু বলল, "গুড। যদি এমনি খুঁজে পেয়ে যাই তাহলে ভালো। যদি পাওয়া না যায় তাহলে একদিন একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান তৈরি করতে হবে।"

বড় ভাই তার মাথার অদৃশ্য চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান?"

"হ্যাঁ। ঘরে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট দিয়ে আগুন লেগে গেছে এরকম একটা সিচুয়েশান। আপনার মা তখন ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে চেষ্টা করবেন—তখন মূল্যবান কাগজপত্র সাথে নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন। ঘরে ভিডিও ক্যামেরা থাকবে, সেটা দিয়ে মনিটর করা হবে, ঠিক কী নিচ্ছেন, সেখান থেকে বোঝা যাবে।"

বড় ভাই মাথা নাড়ল, বলল, "গুড আইডিয়া।"

ছোটাচ্চু বলল, "সেটাও যদি কাজ না করে তাহলে আমরা প্ল্যান 'সি'তে যেতে পারি।"

শুকনো কাঠি বোন জিজ্ঞেস করল, "প্ল্যান সি?"

"হ্যাঁ। স্বাভাবিক খোঁজাখুঁজি হচ্ছে প্ল্যান এ, ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান হচ্ছে প্ল্যান বি। আর প্ল্যান সি হবে ঘর রিনোভেশান।"

"ঘর রিনোভেশান?"

"হ্যাঁ। আপনার মায়ের ঘরে উপর থেকে পানি ঢালতে হবে, বোঝাতে হবে ছাদে ফাটল হয়ে পানি ঢুকছে, পুরো ঘর ভেঙেচুরে ঠিক করতে হবে। তখন গোপন ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে আপনার মা'কে মনিটর করতে হবে। গোপন দলিল যেন হাতছাড়া না হয়ে যায় সে জন্যে আপনার মা সেটা খুঁজে বের করবেন।"

হাঁসফাঁস করতে করতে বড় বোন বলল, "বাসাটা এমনিতেই পুরানো হয়ে গেছে, ঠিক করতে হবে। আর বুড়ি একলা মানুষ তার এত বড় রুমের দরকার কী? কোনার ছোট রুমে ট্রান্সফার করে দিলেই তো বের হয়ে যাবে!"

AMARBOI.COM

বড় ভাই আর বোন সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়। অন্য ভাই-বোনগুলো সারাক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারেও চুপ করে মাছের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছোটাচ্চু বলল, "যদি প্ল্যান সি কাজ না করে তাহলে রয়েছে প্ল্যান ডি। আমি অবশ্যি এটা করতে চাই না, কারণ এটা করতে হলে আমার ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।"

বড় ভাই জিজ্ঞেস করল, "প্ল্যানটা কী শুনি?"

ছোটাচ্চু তখন বেশ আজগুবি প্ল্যান-ডিটা ব্যাখ্যা করতে থাকে।

এদিকে টুনি ডাইনি বুড়ির ঘর খুঁজে বের করে দরজা একটু ফাঁক করে বলল, "দাদু, আসতে পারি?"

ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার। বিছানায় বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে একজন বেশ বয়সী মহিলা বই পড়ছিলেন। মাথা তুলে চশমার ফাঁক দিয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে?"

টুনি ঘরে ঢুকে বলল, "আপনি আমাকে চিনবেন না।"

বয়সী মহিলা কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার কাছে? কী মনে করে?"

টুনি ইতস্তত করে বলল, "আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি।"

মহিলা এবারে কৌতূহলী চোখে টুনির দিকে তাকালেন, বইটা বন্ধ করে বিছানায় রেখে টুনিকে ভালো করে লক্ষ করে একটু হেসে দিলেন। টুনি লক্ষ করল মহিলার সাদা চুল, মুখে বয়সের চিহ্ন, চেহারাটা একটু কঠিন কিন্তু হাসা মাত্রই সব কাঠিন্য দূর হয়ে সেখানে কেমন যেন কৌতুকের একটা ভাব চলে এলো। মহিলা বললেন, "তুমি আমাকে সাবধান করতে এসেছ?"

"জি।"

"কী নিয়ে সাবধান করতে এসেছ?"

টুনি কাছে গিয়ে বিছানার একটা কোনায় বসে বলল, "আমার ছোট চাচাকে নিয়ে।"

"তোমার ছোট চাচা? তোমার ছোট চাচা কী করেছেন?"

"আমার ছোট চাচা একজন ডিটেকটিভ—"

বয়স্কা মহিলা চোখ বড় বড় করে চশমার ফাঁক দিয়ে টুনির দিকে তাকালেন, "সত্যি সত্যি ডিটেকটিভ আছে নাকি? আমি ভেবেছিলাম ওগুলো শুধু গল্পে থাকে।"

"সত্যি সত্যি আছে। ছোট চাচার এজেন্সিটার নাম দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি। কয়েকটা কেস সলভ করেছে।"

"বেশ। তোমার ছোট চাচাকে নিয়ে আমাকে সাবধান করতে এসেছ কেন?"

"আপনার ছেলে-মেয়েরা ছোট চাচাকে একটা কাজ করতে দিয়েছে। আপনার ঘর থেকে একটা দলিল খুঁজে বের করতে দিয়েছে।"

হঠাৎ করে বয়স্কা ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে আবার সেই কাঠিন্য ফিরে এলো। কেমন যেন কঠিন চোখে টুনির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর শীতল গলায় বললেন, "তুমি কেন আমাকে এটা বলতে এসেছ?"

টুনি মাথা নিচু করে বলল, "আমার ছোট চাচা মানুষটা খারাপ না, কিন্তু একটু সহজ-সরল। আপনার ছেলে-মেয়েরা তাকে বুঝিয়েছে—" টুনি কথা শেষ না করে থেমে গেল।

"কী বুঝিয়েছে?"

"বুঝিয়েছে যে আপনি—আপনি—" টুনি আবার কথা না বলে থেমে গেল। এরকম একজন বয়স্ক মহিলার সামনে ডাইনি বুড়ি কথাটা সে বলতে পারল না।

বয়স্ক ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন, "ডাইনি বুড়ি?"

টুনি মাথাটা নিচু করে অস্পষ্ট স্বরে বলল, "হ্যাঁ।"

"আর কী বুঝিয়েছে?"

"বুঝিয়েছে আপনি আপনার ছেলে-মেয়েকে আদর করেন না। আপনার সব সম্পত্তি আপনি নিজের ছেলে-মেয়েদের না দিয়ে নষ্ট করে ফেলছেন, আজেবাজে লোকদের দিয়ে দিচ্ছেন।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আর বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি।"

"আমার ছোট চাচা আপনার ছেলে-মেয়েদের কথা বিশ্বাস করে দলিলটা খুঁজে বের করতে রাজি হয়েছে। কাজটা যে ঠিক না সেটা বুঝতে পারছে না।"

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে রইলেন, একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি ছোট মানুষ, এই বড়দের ব্যাপারে কেন জড়িয়ে গেলে?"

টুনি লাজুক মুখে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি আমার ছোট চাচার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

"অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

"হ্যাঁ। ছোট চাচা যতগুলো কেস সলভ করেছে সবগুলোতে আমি ছিলাম।"

"তুমি ছিলে?"

"হ্যাঁ।" টুনি বলল, "আমি সব সময়েই চাই ছোটাচ্চু"—টুনি একটু থেমে ব্যাখ্যা করল, "ছোট চাচাকে আমরা ছোটাচ্চু ডাকি। আমি চাই ছোটাচ্চু কেস সলভ করুক। শুধু এইবার আমি চাই ছোটাচ্চু যেন কেসটা সলভ করতে না পারে। কিছুতেই যেন আপনার দলিলটা বের করতে না পারে।"

"কেন?"

টুনি মাথা চুলকাল, বলল, "ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক না।"

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুমি ছোট মেয়ে কিন্তু তোমার কথাবার্তা, কাজকর্ম বড়দের মতো।"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "আমার ক্লাশের মেয়েরা আমাকে খালাম্মা ডাকে।"

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন, বললেন, "না। তুমি এখনো খালাম্মা হওনি।"

"কেউ কেউ নানুও ডাকে।"

"সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।" ভদ্রমহিলা বললেন, "তুমি আমাকে সাবধান করতে এসেছ—ঠিক কীভাবে আমাকে সাবধান থাকতে হবে।"

টুনি বলল, "আমার ছোটাচ্চু ঠিক কীভাবে দলিলটা খুঁজবে সেটা বলতে এসেছি।"

"কীভাবে খুঁজবে?"

AMARBOI.COM

"প্রথমে আপনি যখন এই ঘরে থাকবেন না তখন এই ঘরে খুব ভালো করে খুঁজবে।"

ভদ্রমহিলা হাসলেন, বললেন, "জন্মেও পাবে না।"

"তারপর ঘরে একদিন আগুন লাগানোর মতো একটা ব্যবস্থা করবে—আপনাকে বলবে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যেতে—একটা ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে আপনাকে লক্ষ করবে। আপনি জরুরি কাগজপত্র নিয়ে বের হবেন, সেই জরুরি কাগজপত্রের মাঝে দলিলটা থাকবে, সেখান থেকে বের করবে।"

ভদ্রমহিলা টুনির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেমন করে জানো?"

"ছোটাচ্চুর একটা হলুদ বই আছে। সেই বইয়ে লেখা আছে কোন কাজের জন্যে কী করতে হয়। যদি ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করতে না পারে তাহলে আপনার পুরো ঘর ভেঙেচুরে ঠিক করবে। দেখবে আপনি কী করেন। তাও যদি না পারে তাহলে ডাক্তারি ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করবে। আমিও ছোটাচ্চুর বইটা পড়েছি।"

ভদ্রমহিলা কোনো কথা না বলে টুনির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার ফিক করে হেসে ফেললেন, বললেন, "তোমার মতো অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে তোমার ছোটাচ্চু কোনোদিন ডিটেকটিভগিরি করতে পারবে না।"

টুনি কোনো কথা বলল না। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী মেয়ে?"

"কঠিন একটা নাম আছে, এমনিতে সবাই টুনি ডাকে।"

"টুনিই ভালো।"

"দাদু, আমি তাহলে যাই?"

"যাবে? যাও। আমাকে সাবধান করে দিয়েছ সেই জন্যে তোমাকে তো আমার কিছু একটা দেওয়া দরকার। একটা চকোলেটের প্যাকেট কিংবা অন্য কিছু।"

"না না কিছু লাগবে না দাদু।"

ভদ্রমহিলা বিছানার উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা বইগুলো থেকে একটা বই তুলে নিয়ে টুনির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই বইটা

নাও। বই পড়তে ভালো লাগে তো? আজকালকার ছেলে-মেয়েরা তো বই পড়ে না। শুধু টেলিভিশন দেখে।"

"আমি বই পড়ি।"

"চমৎকার। এই বইটা তোমার ভালো লাগবে কি না জানি না—কবিতার বই।"

"টুনি বইটা হাতে নিল, ময়লা একটা কাগজ দিয়ে বইটার মলাট দিয়ে রেখেছেন। একটা বইয়ের প্রচ্ছদটাই সবচেয়ে সুন্দর, সেইটাই যদি ময়লা কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাহলে লাভ কী? টুনি মলাটটা খুলে বইয়ের প্রচ্ছদটা দেখবে নাকি চিন্তা করছিল, মনে হলো ভদ্রমহিলা সেটা বুঝে ফেললেন, বললেন, "মলাটটা খুলে বইটার প্রচ্ছদটা দেখতে পারো। কিন্তু এখানে না। বাসায় গিয়ে।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "বাসায় গিয়ে?"

"হ্যাঁ।" ভদ্রমহিলা ফিক করে হাসলেন, বললেন, "আমি দলিলটা দিয়ে বইয়ের মলাটটা দিয়ে রেখেছি! এখন বুঝেছ কেন কেউ কোনোদিন দলিলটা খুঁজে পায় নাই?"

টুনির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, বলল, "এই মলাটটা সেই দলিল?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কাছে দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। তোমার থেকে বিশ্বাসী মানুষ মনে হয় পাব না।"

"আমি এটা এখন কী করব?"

"রেখে দাও তোমার কাছে। একটা ফটোকপি আমার ছেলে-মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিও। তাহলে বুঝবে আসলটা পাচার হয়ে গেছে।"

"তারা মনে হয় খুব রেগে যাবে।"

"রাগুক। আমার ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হয় নাই। বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অফিসার হয়েছে। ইউনিভার্সিটির মাস্টারও হয়েছে কিন্তু মানুষ হয় নাই।"

টুনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রমহিলা বললেন, "তাদের বাবা এই জমিটা একটা স্কুলকে দান করতে চেয়েছিল। আমি সেই জন্যে স্কুলকে দান করেছি। ছেলে-মেয়ের সহ্য হলো না। শুধু হিসাব করে

আর লাফঝাঁপ দেয়। কারো টাকার কোনো অভাব নাই কিন্তু এই জমিটা ছাড়বে না। জাল দলিল করবে সেই জন্যে অরিজিনালটা নষ্ট করতে চায়!"

টুনি এবারেও কিছু বলল না।

ভদ্রমহিলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এবারে দেখি কী করে!"

টুনি ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। দেখবেন স্কুলকে জমিটা লিখে দিতে পারবেন।"

"ছেলে-মেয়েগুলোকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।"

টুনি কোনো কথা বলল না, কিন্তু কীভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া যায় তার কয়েকটা পরিকল্পনা মাথায় খেলা করতে লাগল। টুনি তার কোনোটাই ভদ্রমহিলাকে বলল না, বলার দরকারও নেই। বইটা বুকে চেপে ধরে রেখে বলল, "আমি যাই?"

"যেতে নেই। বলো আসি।"

"আমি আসি তাহলে?"

"এসো টুনি।"

টুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

ঠিক দুই দিন পর টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে দেখে ছোটাচ্চু তার বিছানায় পা তুলে বসে আছে, মুখটা খুবই বিমর্ষ, ছোটাচ্চু বিয়ে করেনি, ছেলে-মেয়ে নাই, যদি থাকত তাহলে যে কেউ দেখে বলত নিশ্চয়ই তার ছেলে কিংবা মেয়ে মার্ডার হয়ে গেছে, কিংবা কাউকে মার্ডার করে ফেলেছে। ছোটাচ্চু টুনিকে দেখে একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু কথা না বলে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টুনি তখন আরেকবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু বলল, "আর বলিস না। সবকিছু আউলাঝাউলা হয়ে গেছে।"

"কী আউলাঝাউলা হয়ে গেছে?"

"তোর মিসেস জাহানের কেসটার কথা মনে আছে?"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "মিসেস জাহান? সেটা আবার কে?"

"মনে নাই, যাকে প্রথম প্রথম আমি ডাইনি বুড়ি বলেছিলাম? ভদ্রমহিলা খুবই সুইট, খুবই সম্মানী মহিলা। তাকে ডাইনি বুড়ি ডাকাটা খুবই বেকুবির কাজ হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে তোর কথাই ঠিক।"

"আমার কোন কথাই ঠিক?"

"ঐ ভদ্রমহিলা মোটেই ডাইনি বুড়ি না, ডাইনি বুড়া ডাইনি বুড়ি হচ্ছে তার ছেলে-মেয়েগুলো। আমার এই কেসটা নেওয়াই ঠিক হয় নাই।"

টুনি তার চশমার উপর দিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কেন ঠিক হয় নাই?"

"ছেলে-মেয়েগুলো দুই নম্বরি। আসল দলিলটা বের করতে চাচ্ছে কেন জানিস?"

টুনি সবকিছুই জানে কিন্তু তারপরেও ভান করল কিছু জানে না। সরল মুখ করে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"একটা জাল দলিল বের করবে সেই জন্যে। ছেলে-মেয়ে সবগুলো ক্রিমিনাল। আমেরিকা থেকে যেটা এসেছে সেটা রীতিমতো মাফিয়া।"

টুনি মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি তাহলে ওদের জন্যে কাজ করছ কেন? ছেড়ে দাও।"

"ছাড়তেই তো চাই, কিন্তু ছাড়তে পারছি না।"

"কেন ছাড়তে পারছ না?"

ছোটাচ্চু আবার বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মনে নাই, আমি ওদের কাছ থেকে এডভান্স নিয়েছিলাম?"

"এডভান্স ফিরিয়ে দাও।"

ছোটাচ্চু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কেমন করে ফিরিয়ে দেব? খরচ করে ফেলেছি যে! ফারিয়ার জন্মদিন ছিল—আমাকে আমার জন্মদিনে কত কিছু গিফট দেয়, আমি ভাবলাম আমিও এবারে একটা ভালো বার্থডে গিফট দিয়ে অবাক করে দেব!"

"দিয়েছ গিফট?"

"হ্যাঁ। কী যে খুশি হলো ফারিয়া! এখন ফারিয়াকে বলতে হবে গিফটটা যেন ফেরত দেয়—দোকানে গিফটটা ফেরত নিবে কি না

AMARBOI.COM

জানি না। রিকোয়েস্ট করলে একটু ডেমারেজ দিয়ে মনে হয় নিতেও পারে। এখন মুশকিল হচ্ছে ফারিয়াকে বলি কেমন করে!"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না ছোটাচ্চু। এটা তুমি করতেই পারবে না। তুমি যদি এটা করো তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে বাসা থেকে বের করে দিব।"

ছোটাচ্চু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "ঠিকই বলেছিস। আমার মতো অপদার্থ একজন মানুষকে ঘর থেকে বেরই করে দেওয়া দরকার।"

টুনি মুখ গম্ভীর করে বলল, "ছোটাচ্চু তুমি দলিলটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলে?"

"করেছিলাম।"

"পেয়েছ?"

"না।"

"কীভাবে খুঁজেছ?"

"প্রথমে মিসেস জাহানকে বইয়ের দোকানে পাঠানো হলো। ওই মাফিয়া বাহিনীর কাছে মিসেস জাহানের ঘরের তালার চাবি আছে। সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। ঘর ভর্তি বই, প্রত্যেকটা বইয়ের একটা একটা পৃষ্ঠা করে খুঁজেছি। তোষকের নিচে, ড্রয়ারে, আলমারিতে—কোথাও বাকি রাখি নাই।"

টুনির খুবই ইচ্ছে করল একবার জিজ্ঞেস করে মলাট দেয়া বইগুলোর মলাট খুলে দেখেছে কি না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করল না। সরল মুখে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর?"

"এইভাবে খুঁজে না পেয়ে আমি আসল ডিটেকটিভগিরি শুরু করলাম।"

টুনি সবই জানে, তারপরও মুখ গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল, "কী করলে তখন?"

"ঘরের ভিতরে আমার কলমের মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরাটা রেখে ঘরে আগুন দিয়ে দিলাম।"

ঘরের ভিতর আগুন দেয়ার খবর শুনলে যে রকম অবাক হওয়ার কথা সেরকম অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "আগুন!"

"সত্যিকারের আগুন না, ভুয়া আগুন। কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা যায়, কোনো আগুন বের হয় না খালি ধোঁয়া বের হয়। সেই ভুয়া আগুন দিয়ে মিসেস জাহানকে ভয় দেখানো হলো, মিসেস জাহান তাড়াতাড়ি তার বিছানার নিচ থেকে একটা খাম নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।"

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "তারপর?"

"আমি তখন সিওর হয়ে গেলাম যে এই খামের ভিতর দলিলটা আছে। তখন অনেক কায়দা করে সেই খামটা উদ্ধার করা হলো। খামের ভিতর কী ছিল জানিস?"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী?"

ছোটাচ্চু আবার একটা বিশাল নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "একটা সাদা কাগজ। কাগজে একটা কবিতা লেখা।"

"কবিতা?"

"হ্যাঁ।" ছোটাচ্চু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "কবিতাটা শুনতে চাস?"

"বলো।"

ছোটাচ্চু তখন কবিতাটা আবৃত্তি করল :

"আজকালকার পোলাপান
বাপরে কয় তামুক আন।
মা হইল ডাইনি বুড়ি
টাকা-পয়সা সোনার চান।"

টুনি চোখ বড় বড় করে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু বলল, "আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এই কবিতাটা অন্যভাবে শুনেছিলাম। মিসেস জাহান একটু বদলে ফেলেছেন। তার মানে বুঝেছিস?"

টুনি জানতে চাইল, "কী?"

"তার মানে মিসেস জাহান সবকিছু জানেন। তার ছেলে-মেয়েরা যে দুই নম্বরি সেটা জানেন। তারা যে মাফিয়া সেইটা জানেন। তাকে যে তারা ডাইনি বুড়ি ডাকে সেইটাও জানেন। এখন কী মনে হচ্ছে জানিস? আমরা যে আগুনের ভয় দেখিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করব সেইটাও জানেন—আমাদের টিটকারি করার জন্যে কাগজে ঐ কবিতাটা লিখে রেখেছেন। কী রকম বেইজ্জতি হলাম দেখেছিস?"

টুনি মাথা নেড়ে স্বীকার করল যে ছোটাচ্চু যথেষ্ট বেইজ্জতি হয়েছে।

"এখন এই মাফিয়া পার্টি আমার ঘাড়ে সিন্দাবাদের বুড়ার মতো চেপে বসেছে, আমি দলিল বের না করলে আমাকে ছাড়বে না। কী বিপদে যে পড়েছি!"

"দলিল বের করে দাও।"

"দলিল বের করে দিব?" ছোটাচ্চু অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই ভেবেছিস বের করতে পারব? আর যদি পারিও সেটা মাফিয়া পার্টিকে দিব?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু, আমি সেইটা বলি নাই। আমি বলেছি দুই নম্বরি মানুষকে একটা দুই নম্বরি দলিল দাও, তাহলেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়।"

ছোটাচ্চু খানিকক্ষণ হাঁ করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "দুই নম্বরি দলিল? আমি দুই নম্বরি দলিল কোথায় পাব?"

টুনি চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা অবশ্যি ঠিকই বলেছ! দুই নম্বরি দলিল তো আর কিনতে পাওয়া যায় না।"

"দলিল দেখতে কেমন হয় সেইটাও আমি জানি না!" ছোটাচ্চু হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

টুনি তখন ছোটাচ্চুর ঘর থেকে বের হয়ে শান্তকে খোঁজ করে বের করল, সে তার পড়ার টেবিলে বসে পড়ছে—যেটা খুবই বিচিত্র একটা দৃশ্য! শান্তকে কেউ কখনো পড়ার টেবিলে দেখে না। টুনি বলল, "ও, শান্ত ভাইয়া! তুমি লেখাপড়া করছ? তাহলে আমি পরে আসি।"

শান্ত বলল, "পরে আসতে হবে না। যা বলতে চাস এখনই বলে ফেল।"

টুনি বলল, "উঁহু। তুমি এখন পড়ালেখা করো।"

শান্ত গলা নামিয়ে বলল, "আমি পড়ালেখা করছি কে বলেছে? পড়ালেখার ভান করে একটা ফাটাফাটি উপন্যাস পড়ছি।" শান্ত তার পাঠ্য বইয়ের নিচ থেকে একটা রগরগে বই বের করে দেখিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

টুনি বলল, "ঠিক আছে তাহলে।" সে শান্তর সামনে একটা চেয়ারে বসে বলল, "আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?"

AMARBOI.COM

শান্তর চোখ চকচক করে উঠল, বলল, "কত দিবি?"

টুনি বলল, "আমি কোনো টাকা-পয়সা দিতে পারব না। তোমাকে ফ্রি করে দিতে হবে।"

"ফ্রি! আমি?" শান্ত হা হা করে হাসতে লাগল।

"হাসছ কেন? মানুষ কখনো অন্যের জন্যে কাজ করে দেয় না? তুমি যদি করতে না চাও আমি আর কারো কাছে যেতে পারি। আমি তোমার কাছে এসেছিলাম তার কারণ কাজটা অ-স-ম্ভ-ব গোপনীয়।"

এইবারে শান্তর চোখে-মুখে একটু কৌতূহল ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

"কাউকে বলবে না তো?"

"বলব না।"

"আমাকে ছুঁয়ে বলো।"

"তোকে ছুঁয়ে বললে কী হবে?"

"কাউকে বললে আমি মরে যাব।"

"তুই মরে গেলে আমার সমস্যা কী?"

"আমি মরে গেলে তোমার অনেক সমস্যা। আমি ভূত হয়ে এসে তোমার ঘাড় মটকে দেব। তুমি যে ভূতকে ভয় পাও সেইটা আমি বাগানবাড়িতে দেখেছি। মনে আছে—"

শান্ত সেটা মনে করতে চায় না, তাই কথা ঘুরিয়ে বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে। কী করতে হবে তাড়াতাড়ি বল।"

টুনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "মনে আছে ছোটাচ্চু একটা ডাইনি বুড়ির কাছ থেকে জমির দলিল বের করতে চেয়েছিল?"

"হ্যাঁ। মনে হয় শুনেছিলাম।"

"আসলে সেই ভদ্রমহিলা মোটেও ডাইনি বুড়ি না। ভদ্রমহিলা খুবই সুইট। তার ছেলে-মেয়েগুলো হচ্ছে ডাইনি বুড়া আর ডাইনি বুড়ি।"

"তুই কীভাবে জানিস?"

"আমি কথা বলেছি। আমার কাছে এখন সেই দলিলটা আছে। পৃথিবীর কেউ জানে না—আমি আর তুমি ছাড়া।"

শান্ত টুনির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, আজকাল অবশ্যি টুনির কাজকর্ম দেখে সে খুব বেশি অবাক হয় না। টুনি বলল,

"তোমাকে এই দলিলটা স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করে দিতে হবে।"

শান্ত মাথা নেড়ে বলল, "এইটা তো সোজা কাজ। তোকে করে দিব। এখন টাকা-পয়সা না দিলি, পরে বিল করে দিব।"

টুনি বলল, "কাজ শেষ হয় নাই। আরো একটা কাজ বাকি আছে।"

"সেটা কী?"

"দলিলটার একটা প্রিন্ট দিতে হবে। রঙিন, যেন দেখে মনে হয় অরিজিনাল।"

"প্রমি আপুর কাছে স্ক্যানার আছে, স্ক্যান করে দিতে পারব। কিন্তু রঙিন প্রিন্ট কীভাবে করব?"

"সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি।"

"তার মানে আমাকে বাইরে প্রিন্টারের দোকানে যেতে হবে।"

"দরকার হলে যাবে। আমি তোমার জন্যে এত কিছু করি আর তুমি এই ছোট কাজটা করে দিতে পারবে না?"

"তুই আমার জন্যে কী করিস?"

"বাগানবাড়িতে ভূতের ভয় পেয়ে তুমি আর ছোটাচ্চু ভূতের কাছে কত কান্নাকাটি করেছিলে মনে আছে? আমি কাউকে বলেছি?"

শান্ত আবার নরম হয়ে গেল। গজগজ করতে করতে বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে। দে দলিলটা।"

"আরো একটু কাজ করে দিতে হবে।"

কী কাজ?

"দলিলটার রঙিন প্রিন্টের মাঝখানে দুই লাইন কথা ঢুকিয়ে দিতে হবে। ভালো করে লক্ষ না করলে যেন কেউ ধরতে না পারে।"

"কী কথা?"

"একটা কবিতা।"

"কবিতা?"

"হ্যাঁ। কবিতাটা হচ্ছে। টুনি কবিতাটা বলল,

"আজকালকার পোলাপান
বাপরে কয় তামুক আন

মা হইল ডাইনি বুড়ি
টাকা-পয়সা সোনার চান!"

শান্ত হা হা করে হেসে বলল, "এইটা আবার কী রকম কবিতা?"

টুনি বলল, "এখনো শেষ হয় নাই, শেষ দুই লাইন এই রকম :

গ্যান্দা ফুল হলুদ রঙের জবা ফুল লাল
এইটা হলো ফটোকপি সেফ জায়গায় অরিজিনাল।"

কবিতা শুনে শান্ত দুলে দুলে হাসল, তারপর বলল, "তোর ডিটেকটিভ না হয়ে কবি হওয়া উচিত ছিল।"

"সেটা না হয় হব। এখন আমার কাজ করে দাও।"

"ঠিক আছে দে। কখন দরকার?"

"কালকের ভিতরে। যদি সবকিছু ঠিক করে কাজ করো আমি তোমাকে একটু কমিশন জোগাড় করে দিতেও পারি।"

শান্তর চোখে-মুখে এবারে একটু উৎসাহ ফুটে উঠল। বলল, "ঠিক আছে।"

দুপুরবেলার ভিতরে শান্ত এসে টুনিকে তার কাগজপত্র বুঝিয়ে দিল। তার মুখে রাজ্য জয়ের হাসি। টুনিকে বলল, "কী হয়েছে জানিস?"

টুনি বলল, "কী হয়েছে?"

"আমি ভাবলাম তোর কাজ আউল-ফাউল জায়গায় না করে অরিজিনাল জায়গায় করি। কম্পিউটার স্ক্যান, ফটোকপি প্রিন্টিংয়ের জায়গায়। দুই নম্বরি কাজ করার মাঝে তারা এক নম্বর। তোর দলিলের প্রিন্ট একেবারে অরিজিনালের মতো করে দিল। ভিতরে তোর কবিতাটা না থাকলে কেউ বুঝতেই পারত না কোনটা অরিজিনাল কোনটা প্রিন্ট।"

"থ্যাংকু শান্ত ভাইয়া।"

"আমাকে তোর থ্যাংকস দিতে হবে না। তোকে থ্যাংকস।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "আমাকে থ্যাংকস কেন?"

"তোর জন্যেই তো এই ইন্টারেস্টিং স্ক্যানিং প্রিন্টিংয়ের দোকানটা খুঁজে পেলাম। আমার আর কোনো চিন্তা নাই।"

"কেন তোমার চিন্তা নাই?"

AMARBOI.COM

"এই দোকানে সবকিছু পাওয়া যায়। এস.এস.সি.র মার্কশিট, এইচ.এস.সি.র সার্টিফিকেট, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, এম.বি.বি.এস. সার্টিফিকেট, মাস্টার্স, পি-এইচ.ডি সবকিছু। আমি আমার জন্যে একটা পি-এইচডি. সার্টিফিকেট কিনে এনেছি। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। এই দেখ।" শান্ত টুনিকে তার হার্ভার্ডের সার্টিফিকেট দেখাল। কম্পিউটার সায়েন্সে পি-এইচডি. সার্টিফিকেট, সেখানে বড় বড় করে শান্তর নাম লেখা। শান্ত তার পি-এইচডি. সার্টিফিকেট সরিয়ে আরেকটা সার্টিফিকেট বের করল। বলল, "সস্তায় পেয়ে আরো একটা সার্টিফিকেট কিনে এনেছি।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কীসের সার্টিফিকেট?"

"ডেথ সার্টিফিকেট!"

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "কার?"

"আমার। এই দেখ।" টুনি অবাক হয়ে দেখল, "সত্যি সত্যি শান্তর নামে ডেথ সার্টিফিকেট। পরিষ্কার করে লেখা সে "কার্ডিয়াক এরেস্ট" করে মারা গেছে।

টুনি জিজ্ঞেস করল, "এইটা দিয়ে কী করবে?"

"কত কাজে লাগবে! স্কুলের পরীক্ষার সময় ব্যবহার করতে পারি। আম্মুকে ভয় দেখাতে পারি! বন্ধুদের সাথে বাজি ধরার কাজে ব্যবহার করতে পারি!"

শান্ত তার পি-এইচডি. আর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে খুব খোশ মেজাজে অন্যদের দেখানোর জন্যে চলে গেল। টুনি গেল তার নিজের ঘরে। মিসেস জাহান তাকে যে কবিতার বইটা দিয়েছিলেন সেইটার উপরে দলিলের এই রঙিন প্রিন্টটা দিয়ে মলাট দিল। তারপরে ভেতরে একটা পৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়ে লিখল :

প্রিয় দাদু,
এই প্রিন্টটা কোনোভাবে আমার ছোটাচ্চুকে
উদ্ধার করতে দিবেন!
টুনি

তারপর বইটা নিয়ে ছোটাচ্চুর ঘরে গেল। ছোটাচ্চু তখন কাপড়-জামা পরে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাও?"

"আর কোথায়! মাফিয়া পার্টি ডেকে পাঠিয়েছে।"

"মিসেস জাহানের সাথে একটু দেখা করতে পারবে?

"কেন?"

"আমাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন। বইটা পড়া শেষ হয়েছে, তুমি উনাকে ফেরত দিতে পারবে?"

"পারব। দে।" টুনি বইটা ছোটাচ্চুর হাতে দিয়ে বলল, "তার সাথে এইটা।"

"এইটা কী?"

"একটা রাবার।"

"রাবার দিয়ে কী হবে?"

টুনি বলল, "রাবার দিয়ে পেন্সিলের লেখা মোছে।"

ছোটাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলল, "সেটা আমি জানি! মিসেস জাহানকে কেন দিতে হবে?"

"মিসেস জাহানের যদি কোনো পেন্সিলের লেখা মুছতে হয় সে জন্যে!"

"মিসেস জাহানের কেন পেন্সিলের লেখা মুছতে হবে?"

টুনি বলল, "সেটা তোমার জানার দরকার নাই ছোটাচ্চু!"

ছোটাচ্চু বিরক্ত হয়ে রাবারটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল। তারপর আরো বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। টুনি পিছন থেকে বলল, "মিসেস জাহানকে বই আর রাবারটা দিতে ভুলো না যেন।"

ছোটচ্চু আরো বেশি বিরক্ত হয়ে বলল, "ভুলব না।"

মিসেস জাহান তার বিছানায় বসে বই পড়ছিলেন। ছোটাচ্চু ভিতরে ঢুকে বলল, "চাচি, টুনি আপনাকে এই বইটা দিয়েছে। তার নাকি পড়া শেষ হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি!" মিসেস জাহান বইটা হাতে নিলেন, উপরের মলাটটা দেখলেন এবং কিছু একটা অনুমান করলেন।

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু তখন পকেট থেকে রাবারটা বের করে মিসেস জাহানের হাতে দিয়ে বলল, "আপনাকে এই রাবারটাও দিতে বলেছে।"

"বলেছে নাকি? বলে থাকলে দাও। নিশ্চয়ই আমার কাজে লাগবে।" মিসেস জাহান রাবারটা হাতে নিয়ে বললেন, "বাবা, এই বাসায় তোমার কাজ কি শেষ হয়েছে?"

ছোটাচ্চু মুখ কালো করে বলল, "উঁহু, শেষ হয় নাই।"

ভদ্রমহিলা ছোটাচ্চুকে ডেকে বললেন, "তোমাকে একটা কথা বলি বাবা?"

"জি বলেন।"

"আমার ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হয়নি। ওদের বুদ্ধি শুনে কাজ করতে আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। তোমাকে ভোগাবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "জি। আমি বুঝতে পারছি।" তারপর বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সাথে সাথে মিসেস জাহান মলাটটা খুললেন, ভেতর থেকে দলিলের প্রিন্টটা বের করলেন, পেন্সিলে টুনির লেখাটা পড়লেন, নিজের মতো করে একটু হাসলেন। দলিলের ভেতরের কবিতাটা চোখে পড়ল, সেটা পড়ে বাচ্চাদের মতো খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। তারপর রাবারটা দিয়ে টুনির লেখাটা মুছে দলিলের প্রিন্ট কপিটা ভাঁজ করে একটা খামে ঢুকালেন, তারপর গুটি গুটি পায়ে বাইরের ঘরে এলেন। সেখানে ছোটাচ্চুকে ঘিরে ছয় ভাই-বোন বসে আছে, উত্তপ্ত একধরনের আলোচনা চলছে। মা'কে দেখে ছেলে-মেয়েরা চুপ করে গেল। মিসেস জাহান ছোটাচ্চুকে বললেন, "বাবা, তুমি যাওয়ার আগে আমার সাথে একটু দেখা করে যাবে?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল। মিসেস জাহান গুটি গুটি পায়ে হেঁটে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

কিছুক্ষণের মাঝে ছোটাচ্চু মিসেস জাহানের কাছে হাজির হলো। মিসেস জাহান বললেন, "তুমি একা এসেছ তো?"

"জি। আমি একা।"

"এই যে রাবারটা, তুমি টুনিকে ফিরিয়ে দিও। দিয়ে বলো রাবারটার কাজ শেষ হয়েছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "শুধু এইটুকু বলার জন্যে আমাকে ডেকেছেন?"

মিসেস জাহান মাথা নাড়লেন, বললেন, "না। আরো একটু কথা ছিল।"

"জি, বলেন।"

"আমার ঘরে তুমি কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছ, তাই না?"

ছোটাচ্চু লজ্জা পেয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, "না, মানে ইয়ে—আসলে—হয়েছে কী—"

মিসেস জাহান বললেন, "তোমার অপ্রস্তুত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তুমি যেটা খুঁজছ সেটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমার ছেলে-মেয়ে তোমাকে ছাড়বে না।"

ছোটাচ্চু আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এবারে কোনো কথাই বলতে পারল না, শুধু কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। মিসেস জাহান ছোটাচ্চুর দিকে দলিলের প্রিন্ট কপি ভরা খামটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে নাও। এইটা আমার ছেলে-মেয়েদের দিয়ে তাদের শান্ত করা যায় কি না দেখো।"

ছোটাচ্চু খামটা নিল, খুলে দলিলের প্রিন্ট কপিটা বের করে দেখে চমকে উঠল, বলল, "আ—আ—আপনি—আমাকে এটা দিয়ে দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। আমার ছেলে-মেয়ের জন্যে।"

"থ্যাংকু চাচি, অনেক থ্যাংকু।"

"আমাকে থ্যাংকু দিতে হবে না, তোমার ভাতিজিকে থ্যাংকু দিও।"

"ভাতিজিকে? তার মানে টুনিকে? কেন?"

"আমাকে একটা রাবার ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য!" বলে মিসেস জাহান ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। একজন বয়স্কা মহিলা যে চোখ টিপতে পারে সেটা ছোটাচ্চু আগে কখনো দেখেনি, দেখে খুবই অবাক হলো!

ছোটাচ্চু বাসায় আসল খুবই ফুরফুরে মেজাজে। তার পকেটে চেক এবং মুখে হাসি। মাফিয়া বাহিনী দলিলের প্রিন্ট কপি পেয়েই খুশি, তারা বুঝতে পারেনি এটা অরিজিনাল না। দলিলের ভেতরে পুরোটা পড়েনি তাই টুনটুনির কবিতার দুই লাইনও তাদের চোখে পড়েনি।

AMARBOI.COM

টুনটুনির কবিতা তাদের চোখে পড়ল দুই দিন পর, জমি রেজিস্ট্রি করার অফিসে। যে লোক অনেক টাকা খেয়ে জাল দলিল বের করবে বলে কথা দিয়েছিল সে এই প্রিন্ট কপি হাতে নিয়েই খেঁকিয়ে উঠল, "আপনি আমারে দিবেন অরিজিনাল আমি আপনারে দিব জাল জিনিস। আপনারা তো দেখি উল্টা কাজ করলেন—আমার জন্যে নিয়ে আসছেন জাল কপি—"

টাক মাথায় অদৃশ্য চুল টেনে ছেঁড়ার ভঙ্গি করে বড় ছেলে চিৎকার করে বলল, "বুড়ি অরিজিনালটা গায়েব করে দিয়েছে? বাসার মাঝে জাল কপি লুকিয়ে রেখেছে? কত বড় ধুরন্ধর—"

জমি রেজিস্ট্রি করার অফিসের লোক এইবারে আরো জোরে খেঁকিয়ে উঠল, বলল, "কাগজ পড়ে দেখবেন না, এইটা তো জাল দলিলও না—এইটা হচ্ছে তামাশা!"

"তামাশা?"

"হ্যাঁ, এই দেখেন কী লেখা"—মানুষটা তখন পুরো কবিতাটা পড়ে শোনাল। কবিতার শেষ অংশ হচ্ছে :

গ্যান্দা ফুল হলুদ রঙের জবা ফুল লাল
এইটা হলো ফটোকপি সেফ জায়গায় অরিজিনাল

এই দুই লাইন পড়ে লোকটা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "এইখানে তো স্পষ্ট লেখা আছে এইটা ফটোকপি! চোখ দিয়ে দেখেন না? আপনাদের মাথার মাঝে কি গোবর?"

মোটাসোটা বড় মেয়ে হাঁস-ফাঁস করে বলল, "আমরা তাহলে কী করতে পারি?"

"আপনাদের আর কিছু করার নাই। এই বুড়ি অরিজিনালটা পাচার করে দিয়েছে। যাদেরকে জমিটা দিয়েছে তাদের হাতে অরিজিনাল! মামলা করলেই আপনারা জেলে!"

"জেলে?"

"হ্যাঁ। আর এই বুড়ি ডেঞ্জারাস। ঘরে বসে সে যদি আপনাদের মতো আধা ডজন মানুষকে ঘোল খাওয়ায় তার সাথে ঝামেলা করবেন না!"

"ঝামেলা করব না?"

AMARBOI.COM

"না।" লোকটা ভুরু কুঁচকে বলল, "এই বুড়ি আপনাদের কী হয়?"

বড় ছেলে টাক মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আমাদের মা।"

লোকটা প্রথমে চোখ বড় বড় করে তাকাল, তারপর চিৎকার করে বলল, "আপনাদের মা? নিজের মাকে বুড়ি বলে ডাকেন? আপনারা কী রকম মানুষ? দোজখেও তো আপনাদের জায়গা হবে না। আমি টাকা-পয়সার জন্যে জালিয়াতি করি সেইটা এক কথা কিন্তু তাই বলে নিজের মায়েরে তো অপমান করি না! আপনারা বিদায় হন—আর কোনোদিন আমার কাছে আসবেন না। আসলে সোজা পুলিশে দিয়ে দিব।"

মাফিয়া বাহিনী মুখ কালো করে চলে এলো। তিন দিনের ভিতর আমেরিকার দুইজন আমেরিকা চলে গেল। দুবাইয়ের ছেলেটি দুবাই চলে গেল এক সপ্তাহ পর।

দিন দশেক পর একটা কফি হাউজে একজন বয়স্কা মহিলা আর একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখা গেল। দুইজন মাথা খুব কাছাকাছি রেখে ফিসফিস করে ষড়যন্ত্রীদের মতো কথা বলছে। মাঝে মাঝেই দুইজন হি হি করে হাসছে।

বয়স্ক মহিলাটা মিসেস জাহান, বাচ্চা মেয়েটা টুনি।

AMARBOI.COM

টিফিনের ছুটিতে সব ছেলে-মেয়েরা ছুটোছুটি করে খেলছে, টুনি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর একটু হাঁটতেই চোখে পড়ল স্কুল বিল্ডিংয়ের শেষ মাথায় সিঁড়িতে কে যেন একা একা বসে আছে। জায়গাটা একটু নির্জন, কয়েকটা বড় বড় গাছ দিয়ে আবছা অন্ধকার, সাধারণত এখানে কেউ বসে না। মানুষটা কে হতে পারে দেখার জন্যে টুনি একটু এগিয়ে গেল, একটু কাছে যেতেই সে মানুষটাকে চিনতে পারল, তাদের স্কুলের শাপলা আপু।

শাপলা আপু টুনিদের স্কুলের সবচেয়ে তেজি মেয়ে, এই স্কুলে যা কিছু হয় সেখানে শাপলা আপু থাকে। সেই শাপলা আপু এখানে একা একা বসে আছে সেটা অবাক ব্যাপার। শাপলা আপু টুনিকে দেখে ডাকল, "এই টুনি, আয়, এদিকে আয়।"

টুনি এগিয়ে যেতেই শাপলা আপু একটু সরে টুনিকে বসার জায়গা দিয়ে বলল, "আয়। বস আমার সাথে।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে একা একা বসে আছ কেন শাপলা আপু।"

"মনটা খারাপ সেই জন্যে।"

"তোমার কেন মন খারাপ শাপলা আপু?"

"অংক পরীক্ষায় গোল্লা পেয়েছি।"

টুনি অবাক হয়ে শাপলা আপুর দিকে তাকাল, শাপলা আপু অন্য কিছুতে গোল্লা পেলে সে অবাক হতো না কিন্তু অংকে তার গোল্লা পাওয়ার কথা না। গত বছর শাপলা আপু গণিত অলিম্পিয়াডে মেডেল পেয়েছে।

শাপলা টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস হলো না?"

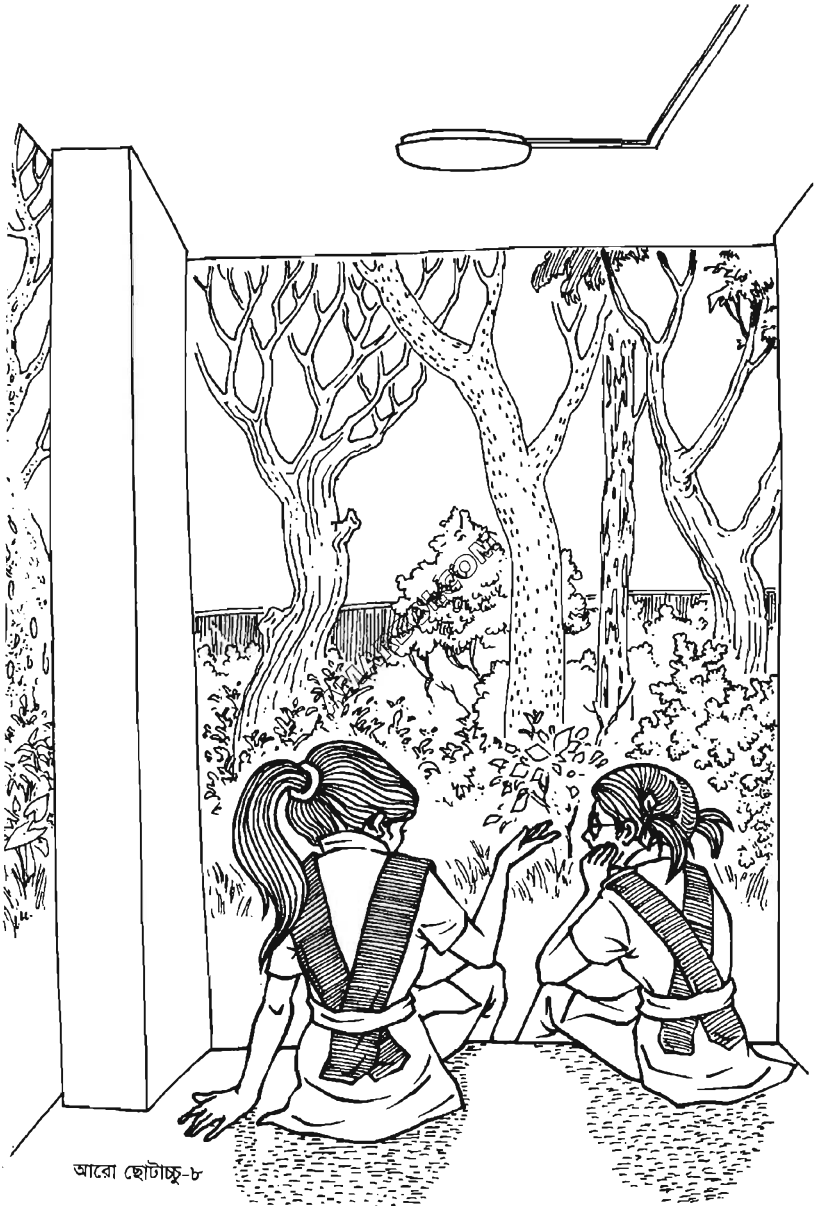

টুনি মাথা নাড়ল, তখন শাপলা তার হাতে ধরে রাখা খাতাটা খুলে দেখাল, বলল, "এই দেখ!"

টুনি দেখল খাতার ওপর বড় বড় করে লাল কালিতে দুইটা শূন্য দেওয়া আছে। খাতায় যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানেও লাল কালিতে কাটাকাটি। দেখে মনে হয় রীতিমতো রক্তারক্তি ব্যাপার। টুনি কী বলবে বুঝতে পারল না, সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "শাপলা আপু, এইবার তোমার কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। তুমি অংকে এত ভালো, পরের বার দেখো—"

শাপলা টুনিকে কথা শেষ করতে দিল না, জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না টুনি, তুই আসল ব্যাপারটাই বুঝতে পারিসনি।"

টুনি বলল, "আসল ব্যাপারটা কী?"

"আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমার অংক একটাও ভুল হয় নাই।"

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "তোমার একটা অংকও ভুল হয় নাই, তাহলে তোমাকে গোল্লা দিয়েছে কেন?"

শাপলা হাত তুলে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো করে বলল, "বাদ দে! তুই ছোট মানুষ বুঝবি না।"

টুনি ব্যস্ত হয়ে বলল, "বুঝব শাপলা আপু। আমি বুঝব, তুমি বলো।"

শাপলা বলল, "এর চাইতে একটা সিগারেট খাই।"

টুনি আঁতকে উঠে বলল, "সিগারেট?"

শাপলা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ সিগারেট। আমার যখন মন খারাপ হয় তখন এইখানে বসে বসে আমি সিগারেট খাই।"

টুনি বলল, "কেউ দেখে নাই?"

"এখনো দেখে নাই।"

"যদি দেখে—"

"দেখলে দেখবে।" বলে শাপলা কোথায় জানি হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল। তারপর খুব সাবধানে প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট বের করে মুখে দিয়ে দুই ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে একটা ম্যাচের কাঠি দিয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে বুক ভরে একটা টান দিয়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

টুনি মুগ্ধ হয়ে শাপলা আপুর দিকে তাকিয়ে রইল, কারণ আসলে তার কাছে কোনো সিগারেটের প্যাকেট, সিগারেট, ম্যাচ কিছু নেই। পুরোটা মিছিমিছি। শাপলা আপু তার অদৃশ্য সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই খাবি একটা?"

টুনি বলল, "আমি তোমার মতো করে খেতে পারব না।"

"চেষ্টা করে দেখ। লজ্জার কী আছে?" শাপলা তার অদৃশ্য সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা অদৃশ্য সিগারেট বের করে টুনিকে দিল। টুনি একটু লজ্জা পাচ্ছিল, তারপরেও শাপলার দেখাদেখি কাল্পনিক সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়ে টান দেওয়ার ভান করল।

শাপলা বলল, "বুঝলি টুনি, যখন আমার মন খারাপ হয় তখন এখানে বসে বসে সিগারেট টানি। কোনো কোনোদিন আস্ত একটা প্যাকেট শেষ করে ফেলি।"

টুনি বলল, "এত সিগারেট খাওয়া ভালো না শাপলা আপু।"

"জানি।" শাপলা আপু বলল, "কী করব বল। মনটা ভালো নাই।"

"তোমার সব অংক শুদ্ধ তার পরেও তোমাকে গোল্লা কেন দিল?"

"তুই শুনে কী করবি? তোরও মন খারাপ হবে।"

"হবে না। তুমি বলো।"

শাপলা তার কাল্পনিক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "আমাদের অংক করান ফাক্কু স্যার।"

ফাক্কু স্যারের নিশ্চয়ই অন্য কোনো নাম আছে, তার বাবা-মা নিশ্চয়ই তার ছেলের নাম ফাক্কু রাখেননি কিন্তু সেই নামটা স্কুলের কোনো ছাত্রছাত্রী জানে বলে মনে হয় না।

শাপলা বলল, "ফাক্কু স্যার আমাকে চ্যালেঞ্জও দিয়েছে যে আমি কোনোদিন তার পরীক্ষায় পাস করতে পারব না।"

"কেন?"

"আমি ফাক্কু স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি না সেই জন্যে।"

"তুমি কার কাছে প্রাইভেট পড়ো?"

"আমি কারো কাছে প্রাইভেট পড়ি না।"

"অ।"

AMARBOI.COM

"ফাক্কু স্যারের কাছে প্রাইভেট না পড়লে অংকে ফেল। আমার বেলা শাস্তিটা একটু বেশি কঠিন। পুরোপুরি গোল্লা—"

"তুমি কাউকে বলো নাই?"

"কাকে বলব? ফাক্কু স্যার হচ্ছে স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টের আপন শালা। আমাদের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম পর্যন্ত ফাক্কু স্যারকে ভয় পায়।"

"তোমার আব্বুকে বলো না কেন?"

"লাভ নাই। আব্বু দেখে আর হাসে।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "হাসে? হাসে কেন?"

"আব্বুর ধারণা এই রকম মানুষের সাথে পরিচয় হওয়া ভালো। তাদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করলে নাকি মানসিক শক্তি হয়।"

"মানসিক শক্তি?"

"হ্যাঁ। মানসিক শক্তি। চারিত্রিক গুণ। আত্মবিশ্বাস। বাস্তবতাবোধ।"

"এত কিছু?"

"আরো আছে। সবগুলো মনে নাই।"

টুনি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "তাহলে তোমার আম্মুকে বলো না কেন?"

"বলেছি। প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর সময় বলি।"

"তোমার আম্মু কিছু করবেন না?"

"করলে তো ভালো।"

"কী করবেন?"

শাপলা আপু মুখ গম্ভীর করে বলল, "বলেছি কোনো একটা অমাবস্যার রাতে ফাক্কু স্যারের ঘাড়টা মটকে দিতে।"

"ঘাড় মটকে দিতে?"

"হ্যাঁ। আমার আম্মু তো মরে গেছে। মানুষ মরে গেলে ভূত হয়—আমার আম্মু নিশ্চয়ই ভূত হয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই ঘাড় মটকাতে পারে। কেন যে ফাক্কু স্যারের ঘাড় মটকাচ্ছে না!"

টুনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে করে শাপলা আপুর হাতটা ছুঁয়ে বলল, "আপু, আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি জানতাম না তোমার আম্মু মারা গেছেন।"

"কেমন করে জানবি? আমি কি সবাইকে বলে বেড়াই নাকি?"

AMARBOI.COM

টুনি কিছু বলল না, শাপলা আপু তখন আরেকটা সিগারেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, "বার্ষিক পরীক্ষা আসছে তো, এইটা হচ্ছে ফাক্কু স্যারের সিজন।"

"সিজন?"

"হ্যাঁ, যারা ফাক্কু স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে তাদের সবাইকে বাড়তি এক হাজার টাকা দিতে হবে।"

"এক হাজার টাকা?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"অংক পরীক্ষার সাজেশন।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "সাজেশনের জন্য এক হাজার টাকা?"

"মুখে বলে সাজেশন আসলে ফাক্কু স্যার পুরো প্রশ্নটা বলে দেয়, একেবারে দাঁড়ি-কমাসহ।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো মিথ্যা নাকি?"

"কাজটা ঠিক হচ্ছে না।" টুনি বলল, "একেবারেই ঠিক হচ্ছে না।"

"আমি কি ঠিক করেছি জানিস?"

"কী?"

"বোমা মেরে ফাক্কু স্যারের বাড়িটা উড়িয়ে দেব।"

টুনি শাপলা আপুর দিকে তাকাল, এটাও নিশ্চয়ই তার সিগারেট খাওয়ার মতো ব্যাপার। শাপলা মুখটা গম্ভীর করে বলল, "দশ কেজি প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ অর্ডার দিয়েছি।"

টুনি হাসি চেপে বলল, "কোথা থেকে অর্ডার দিয়েছ?"

"একেবারে সরাসরি সি.আই.এ.'র কাছে।"

"সি.আই.এ. তোমাকে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিল?"

"প্রথমে দিতে চায় নাই, তারপর যখন নিউক্লিয়ার বোমার একটা ডিজাইন দিলাম তখন দিয়ে দিল।"

টুনি শাপলার মুখের দিকে তাকিয়ে হি হি করে হেসে ফেলল, বলল, "তুমি কখন ফাক্কু স্যারের বাড়িটা ওড়াবে?"

AMARBOI.COM

"এখনো ঠিক করি নাই, সমস্যাটা কি জানিস?"

"কী?"

"ফাক্কু স্যারের বউ-বাচ্চা। তারা তো কোনো দোষ করে নাই, ফাক্কু স্যারের দোষের জন্যে বউ-বাচ্চাকে কষ্ট দেওয়া কি ঠিক হবে?" শাপলা খুব চিন্তিত মুখে সিগারেট টানতে থাকে, টুনি মুগ্ধ চোখে শাপলার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্কুলের সবাই জানে শাপলা আপু খুব মজার মেয়ে কিন্তু এত মজার মেয়ে টুনি জানত না। নিজের কষ্ট নিয়েও মজা করতে পারে—এরকম মানুষ কয়জন আছে?

সেদিন রাত্রি বেলা শান্ত ঘোষণা দিল সে লেখাপড়া ছেড়ে দেবে। একজন জিজ্ঞেস করল, "কেন লেখাপড়া ছেড়ে দিবে?"

"মানুষ লেখাপড়া করে সার্টিফিকেটের জন্যে। আমি এর মাঝে সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি। হার্ভার্ড থেকে পি-এইচডি.।"

সে কীভাবে এই সার্টিফিকেট পেয়েছে সেটা মোটামুটিভাবে সবাই এত দিনে জেনে গেছে, তাই কেউই বেশি অবাক হলো না। একজন সন্দেহপ্রবণ বাচ্চা জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তোমার তো এস.এস.সি. না হয় এইচ.এস.সি. সার্টিফিকেট নাই।"

"পি-এইচডি. সার্টিফিকেট থাকলে আর কিছু লাগে না। পি-এইচডি. হচ্ছে সব লেখাপড়ার বাবা।"

লেখাপড়া নিয়ে শান্তর কথাবার্তা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করল না, শুধু টুনি জিজ্ঞেস করল, "তুমি সত্যি লেখাপড়া ছেড়ে দেবে?"

"হ্যাঁ। ছেড়ে দিতেই হবে। আমাদের একজন অংকের ম্যাডাম এসেছে, তার উৎপাতে আমাদের সবার লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হবে।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কেন? কী করেছে অংক ম্যাডাম?"

শান্ত বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী করে নাই? প্রথম দিনেই এসে বলে কোনো কিছু মুখস্থ করা যাবে না। সবকিছু বুঝে বুঝে পড়তে হবে!"

টুনি দুর্বলভাবে বলল, "মনে হয়তো ঠিকই বলেছেন।"

শান্ত চিৎকার করে বলল, "কী বললি? ঠিকই বলেছেন? এর মাঝে কোন জিনিসটা তোর ঠিক মনে হচ্ছে?"

টুনি আমতা আমতা করে বলল, "বুঝে বুঝেই তো পড়তে হয়!"

শান্ত তার দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "কাঁচকলা! লেখাপড়া করতে করতেই জান শেষ আর এখন সেটা বুঝতেও হবে? আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই?"

শান্তর মেজাজ গরম দেখে একজন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কীভাবে লেখাপড়া করবে?"

"ঝাড়া মুখস্থ। কী পড়তে হবে বলে দেবে, সেটা ঝাড়া মুখস্থ করব। পরীক্ষার সময় লিখে দিয়ে আসব।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "অংকও মুখস্থ করবে?"

"একশ'বার। সবার আগে অংক মুখস্থ করব। দশটা অংক দেখিয়ে দেবে, সেগুলো ঝাড়া মুখস্থ করে রাখব। পরীক্ষায় সেই অংকগুলো দেবে আর আমরা সেগুলো লিখে দেব।"

শান্তর লেখাপড়ার পদ্ধতির বিরুদ্ধে কারো কথা বলার সাহস হলো না। শান্ত নিজেই খানিকক্ষণ গজগজ করে বলল, "আর আমাদের অংক ম্যাডাম বলে সব বুঝে বুঝে পড়তে হবে! বুঝে বুঝে অংক করতে হবে। সপ্তাহে সপ্তাহে অংক পরীক্ষা। ফাইনাল পরীক্ষার আগে প্রশ্নটা কেমন হবে দেখানোর জন্যে আরেকটা পরীক্ষা নিয়েছে। সেই প্রশ্নটা একবার দেখবি?"

AMARBOI.COM

শান্তর প্রশ্ন দেখার কারো কৌতূহল ছিল না কিন্তু শান্ত তার ব্যাগ ঘেঁটেঘুঁটে একটা প্রশ্ন বের করে সবাইকে দেখানোর জন্যে এগিয়ে দিল। কেউ সেটা দেখার জন্যে নিচ্ছে না দেখে টুনি হাতে নিল।

শান্ত বলল, "তুই খালি একবার প্রশ্নটা দেখ! এটা কী রকম প্রশ্ন? এই প্রশ্ন করার জন্য অংক ম্যাডামের নামে মামলা করা দরকার ছিল।"

টুনি কিছু বলল না। শান্ত বলল, "আমি কি ঠিক করেছি জানিস?"

"কী?"

"আমাদের ক্লাশ থেকে আন্দোলন করব, প্রথমে মানববন্ধন তারপর গাড়ি ভাংচুর। কী কী স্লোগান দিব সেইটাও ঠিক করে ফেলেছি।"

স্লোগানের কথা শুনে অনেকেই উৎসাহী হলো, একজন জিজ্ঞেস করল, "কী স্লোগান?"

শান্ত মুখ সুচালো করে বলল, "একটা হচ্ছে :

মুখস্থ করতে চাই
নইলে কারো রক্ষা নাই।

আরেকটা হচ্ছে :

গাড়ির চাকা ঘুরবে না
বোঝাবুঝি চলবে না।

আরেকটা হচ্ছে :

হাইফাই ফিটফাট
পড়াশোনা শর্টকাট।"

বাচ্চা-কাচ্চা যারা ছিল তারা সবাই মাথা নেড়ে স্বীকার করল স্লোগানগুলো বেশ ভালো হয়েছে। ভালো স্লোগান না হলে আন্দোলন করা যায় না।

টুনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ক্লাশের ছেলে-মেয়েরা সবাই আন্দোলন করতে রাজি হয়েছে?"

শান্ত মুখ ভোঁতা করে বলল, "সেইটাই হয়েছে মুশকিল। সবগুলো ছেলে-মেয়ে ভ্যাবলা টাইপের, কারো ভেতর কোনো তেজ নাই। সহজে রাজি হতে চায় না। কিছু কিছু আছে দালাল, ম্যাডামকে খুশি করার জন্যে বলে, বুঝে বুঝে লেখাপড়া করাই হচ্ছে আসল লেখাপড়া। এই ছেলে-মেয়েগুলো হচ্ছে বড় সমস্যা—এদের জন্যে দেশের কোনো উন্নতি হয় না!"

শান্ত কথা শেষ করে রেগেমেগে চলে গেল। টুনির হাতে তখনো শান্তর স্কুলের অংক ম্যাডামের প্রশ্ন, যেটা মুখস্থ করে পরীক্ষা দেয়া সম্ভব না। প্রশ্নটা কী করবে বুঝতে না পেরে টুনি সেটা আপাতত নিজের কাছেই রেখে দিল। সে তখনো জানত না এই প্রশ্নটা কয়দিনের মাঝেই তার কাজে লেগে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা টুনি ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ছোটাচ্চু, একজন মানুষ যদি অন্যায় কাজ করে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে কি আরেকটা অন্যায় কাজ করা যায়?"

ছোটাচ্চুর মনে হলো প্রশ্নটা খুব পছন্দ হয়েছে, প্রশ্নটা শুনেই তার মুখ একশ' ওয়াট বাল্বের মতো জ্বলে উঠল, চোখগুলো উত্তেজনায় চকচক করতে লাগল। সোজা হয়ে বসে বলল, "তুই একটা মিলিয়ন

ডলার প্রশ্ন করেছিস। তোর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের আগে বুঝতে হবে আমরা অন্যায় বলতে কী বোঝাই। এটা কি মানুষের চোখে অন্যায় নাকি দেশের আইনের চোখে অন্যায়। তুই যদি বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করিস তাহলে কি দেখবি জানিস? দেখবি শাসকগোষ্ঠী নিজেদের রক্ষা করার জন্যে কিছু কিছু কাজকে বলে অন্যায়। তাদের স্বার্থে যখন আঘাত করে—"

ছোটাচ্চু এই ভাষায় টানা পনেরো মিনিট কথা বলে গেল। টুনি প্রথম কয়েক মিনিট ছোটাচ্চুর কথা বোঝার চেষ্টা করল তারপর হাল ছেড়ে দিল। সে ছোটাচ্চুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কথা শোনার ভান করল, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ল কিন্তু তার কোনো কথাই শুনল না।

বসার ঘরে প্রমির সাথে দেখা হলো, প্রমি এই বাসার বাচ্চাদের মাঝে মোটামুটি জ্ঞানী-গুণী মানুষ। টুনি তাকে একই প্রশ্ন করল, "আচ্ছা প্রমি আপু, একজন মানুষ যদি অন্যায় কাজ করে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে কি আরেকটা অন্যায় কাজ করা যায়?"

প্রমি আপু কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।' তার অর্থ কী? তার অর্থ তুই যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ না করিস তোকে সবাই ঘৃণা করবে। কাজেই তোকে কিছু একটা করতেই হবে। কবিগুরু পরিষ্কার করে বলেন নাই তুই সে জন্যে আরেকটা অন্যায় করতে পারবি কি না—"

টুনি বলল, "আমি ঠিক কবিগুরুর মতামত জানতে চাচ্ছিলাম না, তোমার মতামত জানতে চাচ্ছিলাম।"

প্রমি মুখ শক্ত করে বলল, "আমার মতামত জানতে হলে তোকে সুনির্দিষ্টভাবে পুরো বিষয়টা বলতে হবে। প্রথম অন্যায়টা কী সেটা বলতে হবে। মানুষটা কে বলতে হবে, তাকে কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে সেটা জানতে হবে, সেই শাস্তি দেওয়ার জন্যে কী অন্যায় করা হবে সেটাও জানতে হবে।"

টুনির পক্ষে এত কিছু বলা সম্ভব না, তাই প্রমির মতামত জানা হলো না। শান্তকে এই প্রশ্ন করে খুব একটা লাভ হবে না জেনেও টুনি একটু চেষ্টা করল, শান্ত পুরো প্রশ্নটা না শুনেই বলল, "পিটিয়ে তক্তা করে

amarboi.com

দে।" টুনি যখন টুম্পাকে এই প্রশ্নটা করল তখন টুম্পা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করল, "তুমি কি রবিন হুডের কথা বলছ?" টুনি রবিন হুডের কথা জিজ্ঞেস করছিল না কিন্তু বুঝতে পারল টুম্পা ঠিকই বলছে, রবিন হুড ছিল ডাকাত কিন্তু কেউ তাকে খারাপ বলে না, কারণ সে অত্যাচারী বড়লোক থেকে টাকা ডাকাতি করে গরিবদের দিত! গল্পে সবই সম্ভব।

টুনি কারো কাছ থেকে পরিষ্কার উত্তর পাচ্ছিল না, শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার করে উত্তর দিল ঝুমু খালা, রান্নাঘরে পরাটা ভাজতে ভাজতে বলল, "ধরা না পড়লে ঠিক আছে।"

কাজেই টুনি সিদ্ধান্ত নিল ফাক্কু স্যারকে একটু সাইজ করার চেষ্টা করবে। কাজটা শেষ পর্যন্ত করতে পারবে কি না জানে না, কিন্তু তাতে সমস্যা নেই, সে যে এটা করার চেষ্টা করছে সেটাও কেউ জানে না। ধরা পড়ার কোনো প্রশ্নই নাই।

পরদিন স্কুলে গিয়ে সে স্কুলের অফিসে হাজির হলো। তাদের স্কুলের অফিসে যে কয়েকজন কাজ করে তার একজন হচ্ছে রওশন খালা, মাঝবয়সী হাসি-খুশি মহিলা। টুনিকে দেখে রওশন খালা কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে তাকাল। টুনি বলল, "আপনি কি খুব ব্যস্ত?"

রওশন খালা বলল, "আমি সব সময়েই খুব ব্যস্ত—তাতে সমস্যা নাই। কী বলবে বলো।"

"এই স্কুলে কি এডভান্স ছুটি নেওয়া যায়?"

রওশান খালা অবাক হয়ে বলল, "এডভান্স ছুটি? সেটা আবার কী?"

"আমরা যদি স্কুলে না আসি তাহলে আব্বু-আম্মুর চিঠি আনতে হয়। আগেই চিঠিটা এনে পরে স্কুলে না আসলে কি হবে?"

"স্কুলে আসতে চাও না কেন?"

"না—মানে—আব্বু সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়।" কথাটা সত্যি নয় কিন্তু তথ্য বের করার জন্যে এরকম প্রশ্ন করা মনে হয় ঠিকই আছে।

রওশন খালা মুখটা গম্ভীর করে বলল, "পড়াশোনার ক্ষতি করে বেড়ানো ঠিক না। যখন ছুটি হয় তখন যাও।"

AMARBOI.COM

টুনি বলল, "আমিও তো তাই বলি। আব্বু বুঝতে চায় না।"

রওশন খালা মুখটা আরো গম্ভীর করে বলল, "না না, এটা না বুঝলে হবে না। এটা বুঝতে হবে। পড়ালেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ..." এরপর রওশন খালা লেখাপড়ার গুরুত্বের ওপর উপদেশ দিতে শুরু করল। টুনিও গম্ভীর মুখে উপদেশটা শুনতে থাকে, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে। একজন বড় মানুষকে খুশি করার এইটা হচ্ছে সবচেয়ে সোজা উপায়, তাকে উপদেশ দেওয়ার একটা সুযোগ করে দেয়া। একজন বড় মানুষ ছোট একজন ছেলে-মেয়েকে যত বেশি উপদেশ দিতে পারবে সে তার উপর তত খুশি হয়ে উঠবে। কাজেই উপদেশ দেয়া শেষ করে রওশন খালা টুনির উপর খুব খুশি হয়ে উঠল।

টুনি উপদেশগুলো শুনে চলে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বলল, "এখন আপনাদের অনেক বেশি পরিশ্রম তাই না রওশন খালা?"

রওশন খালা হেসে বলল, "আমাদের সব সময় পরিশ্রম।"

"কিন্তু এখন তো ফাইনাল পরীক্ষা আসছে, তাই অনেক বেশি পরিশ্রম। এতগুলো ক্লাশের এতগুলো প্রশ্ন ছাপাতে হবে।"

রওশন খালা মাথা নাড়ল, বলল, "না। প্রশ্ন আমাদের ছাপাতে হয় না। ওগুলো টিচারেরা ছাপেন। এগুলো স্কুলেও ছাপায় না, বাইরে থেকে ছাপিয়ে নেয়!"

টুনি ব্যাপারটা শুনে খুব খুশি হলো। ভান করে বলল, "যাক বাবা! আপনাদের এই ঝামেলা করতে হয় না!" কিন্তু এখন জানা দরকার কোথা থেকে প্রশ্নগুলো ছাপানো হয়। সরাসরি কিছুতেই সেটা জিজ্ঞেস করা যাবে না, তাই সে আজকের মতো এখানেই শেষ করে দিল।

পরের দিন টুনি আবার রওশন খালার কাছে হাজির হলো, বলল, "রওশন খালা, আপনাকে আমি প্রত্যেক দিন ডিস্টার্ব করছি, আপনি আমার উপরে রাগ হচ্ছেন না তো?"

রওশন খালা হেসে বলল, "না রাগ হচ্ছি না। বলো কী বলবে?"

"আমাদের ক্লাশ টিচার হচ্ছেন ফৌজিয়া ম্যাডাম। ফৌজিয়া ম্যাডাম খুবই সুইট।"

"হ্যাঁ, খুবই সুইট। খুবই এনার্জেটিক।"

AMARBOI.COM

"আমরা ম্যাডামের বার্থডেতে তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। সব ছেলে-মেয়ে সাইন করে একটা কার্ড বানিয়ে তার ই-মেইলে পাঠিয়ে দেব। ঠিক রাত বারোটা এক মিনিটে।"

"খুবই ভালো আইডিয়া।"

"ম্যাডামের ই-মেইলটা জানি না, আপনি কি দিতে পারবেন একটু কষ্ট করে? ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলে ম্যাডাম বুঝতে পারবে।"

রওশন খালা বলল, "অবশ্যই দিতে পারব।" তারপর উঠে কোথা থেকে একটা ফাইল এনে সেটা খুলে একটা লিস্ট বের করল। সেখানে স্কুলের সব টিচারদের ই-মেইল এড্রেস লেখা। রওশন খালা যখন ফৌজিয়া ম্যাডামের ই-মেইল এড্রেসটা একটা ছোট কাগজে লিখে দিচ্ছে তখন টুনি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ফাক্কু স্যারের ই-মেইল এড্রেসটা দেখে নিল। তারা আসলেই ফৌজিয়া ম্যাডামের কাছে একটা বার্থডে কার্ড পাঠাবে কিন্তু এই মুহূর্তে তার ফাক্কু স্যারের ই-মেইল এড্রেসটা দরকার। কেন দরকার সে এখনো জানে না, কিন্তু দরকার।

সন্ধ্যেবেলা টুনি শান্তকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শান্ত ভাইয়া, তুমি যদি একজন মানুষের ই-মেইল এড্রেস জানো তাহলে কি তার ই-মেইলগুলো দেখতে পারবে?"

AMARBOI.COM

"অবশ্যই পারব। না পারার কী আছে!"

"কীভাবে?"

"দশ টাকা।"

অন্য যেকোনো মানুষ হলে শান্তর কথা শুনে থতমত খেয়ে যেত কিন্তু টুনি যেহেতু শান্তকে চিনে তাই সে থতমত খেলো না, বুঝতে পারল এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে হলে দশ টাকা দিতে হবে। টুনি বলল, "দুই টাকা।"

"পাঁচ টাকার এক পয়সা কম না।"

টুনি তার ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে শান্তকে দিয়ে বলল, "নাও।"

শান্ত পাঁচ টাকার নোটটা ভালো করে দেখে পকেটে ঢুকিয়ে বলল, "কাজটা খুবই সোজা। প্রথমে মেইল আইডি লিখবি তারপর পাসওয়ার্ড লিখবি। তখন সব ই-মেইল দেখতে পাবি।"

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "এইটা তো সবাই জানে। আমি কি এইটা জানতে চেয়েছি নাকি? আমি জানতে চাচ্ছি পাসওয়ার্ড না জানলে অন্যের ই-মেইলে ঢোকা যায় নাকি।"

"সেটা তুই আগে বলিসনি।"

টুনি বলল, "আমার টাকা ফেরত দাও।"

শান্ত দাঁত বের করে হেসে বলল, "টাকা হচ্ছে যৌবনের মতন, একবার বের হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।"

"এটা চোট্টামি।"

"আর তুই যেটা জিজ্ঞেস করেছিস সেটা হচ্ছে সাইবার ক্রাইম। আমি চোর হলে তুই ডাকাত।"

"টাকা ফেরত দাও শান্ত ভাইয়া।"

"টাকা ফেরত পাবি না কিন্তু তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।"

শান্ত এখন কোন ধরনের চোট্টামি করবে জানা নেই, টুনি তাই কোনো কথা না বলে শান্তর দিকে তাকিয়ে রইল। শান্ত বলল, "অন্যের ই-মেইলে ঢোকা হচ্ছে হ্যাকিং। যারা ভালো হ্যাকার তারা করতে পারে। আমার পরিচিত একজন সুপারডুপার হ্যাকার আছে। আদনান ভাই, কলেজে পড়ে। ফার্স্ট ইয়ার। আদনান ভাই হ্যাক করে গভমেন্টের ওয়েবসাইটে ঢুকে মন্ত্রীদের নাম উল্টাপাল্টা করে দিয়েছিল।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সেইটা করে খুব বিপদে পড়েছে।"

"কী বিপদ?"

"পুলিশ আর র‍্যাব ধরে নিয়ে গেছে। জামিনে ছাড়া পেলে তোর কথা বলতে পারি। আগে থেকে বলে রাখছি, আদনান ভাইয়ের রেট কিন্তু খুব হাই।"

টুনি বলল, "থাক দরকার নাই।"

টুনি যখন চলে যাচ্ছিল তখন শান্ত বলল, "যে মানুষের ই-মেইল হ্যাক করবি সেই মানুষটা যদি গাধা টাইপের হয় তাহলে তুই নিজেও হ্যাক করার চেষ্টা করতে পারিস।"

"আমি নিজে?"

"হ্যাঁ। গাধা টাইপের মানুষদের পাসওয়ার্ড খুব সোজা হয়। বেশিরভাগ সময় নিজের বাচ্চার নাম দিয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করে। বাচ্চার নাম যদি ছোট হয় নামের শেষে ওয়ান টু থ্রি লিখে লম্বা করে। আট অক্ষরের পাসওয়ার্ড বানায়।

শান্ত ঠাট্টা করছে নাকি সত্যি বলছে টুনি বুঝতে পারল না। যদি সত্যি বলে থাকে তাহলে এইটুকু তথ্যের জন্যে পাঁচ টাকা খরচ করা যায়। কাজেই সে আর পাঁচ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্যে চাপাচাপি করল না। করেও কোনো লাভ হতো না, শান্ত ঠিকই বলেছে, টাকা হচ্ছে যৌবনের মতো—একবার বের হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না, বিশেষ করে সেটা যদি শান্তর কাছে যায়।

পরদিন স্কুলে গিয়ে টুনি শাপলাকে খুঁজে বের করল। শাপলাকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন না, টিফিন ছুটিতে যেখানে সবচেয়ে বেশি হইচই হয় সেখানেই শাপলা থাকে। আজকে শাপলাকে পাওয়া গেল ক্লাশ সিক্সের ছেলে-মেয়েদের মাঝে, ক্রিকেট খেলা নিয়ে সেখানে প্রায় খুনোখুনি হয়ে যাচ্ছিল, শাপলা সেটা কোনোমতে সামলে নিয়েছে। আবার যখন খেলা শুরু হলো তখন টুনি শাপলার কাছে গিয়ে বলল, "শাপলা আপু।"

"কী হলো?"

"তুমি কি আমাকে একটা জিনিস বলতে পারবে? জিনিসটা সিক্রেট।"

"উহ। আমি কাকে বিয়ে করব আর কাকে মার্ডার করব সেই সিক্রেট জিনিসগুলো তোকে বলতে পারব না।"

টুনি হেসে ফেলল, বলল, "না। আমি এই দুইটা সিক্রেট জিনিস জানতে চাচ্ছি না।"

"তাহলে বল।"

টুনি ফিসফিস করে বলল, "ফাক্কু স্যারের বউ আর ছেলে-মেয়ের নামগুলো আমাকে বলতে পারবে?"

শাপলা অবাক হয়ে বলল, "কী করবি?"

"আমার একটা খুবই সিক্রেট প্রজেক্ট আছে, সেটার জন্যে দরকার।"

AMARBOI.COM

শাপলা মুখ সুচালো করে বলল, "আমার জানা নাই। কিন্তু আমাদের ক্লাশের সব ছেলে-মেয়ে এই স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে, তারা প্রত্যেক দিন স্যারের বাসায় যায়। তারা নিশ্চয়ই জানে। শুনেছি বউটা ভালো। ছেলে-মেয়েগুলো ছোট ছোট কিন্তু দুইটাই পাজি। মেয়েটা মিচকি শয়তান আর ছেলেটা খুবই দুষ্টু। ফাক্কু স্যার ছেলেটাকে লাই দিয়ে দিয়ে মিনি সন্ত্রাসী বানিয়ে ফেলেছে।"

টুনি বলল, "আমার শুধু নামগুলো দরকার।"

"ভালো নাম, না ডাকনাম?"

"ডাকনাম বেশি দরকার।"

"ঠিক আছে, এখনই তোকে বলছি।"

টুনি ব্যস্ত হয়ে বলল, "তোমায় এখনই বলতে হবে না। এক-দুই দিন পরে হলেও হবে!"

শাপলা বলল, "আমি কোনো কাজ ফেলে রাখি না। ঝটপট করে ফেলি।"

কাজেই পাঁচ মিনিটের মাঝে শাপলা ফাক্কু স্যারের বউ-বাচ্চার নাম নিয়ে এলো। বউয়ের নাম নীলুফার, ফাক্কু স্যার শর্টকাট করে ডাকে নীলু। মেয়েটার নাম ফারজানা, ফাক্কু স্যার আদর করে ডাকে ফারু আর যখন রেগে যায় তখন ডাকে ফারজাইন্যা! ছেলেটা ছোট, নাম ফয়সল, ফাক্কু স্যার আদর করে ডাকে ফপু। শাপলার ক্লাশের যে ছেলে-মেয়েরা ফয়সলের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ, তারা তাকে ডাকে ফয়জন—পয়জনের কাছাকাছি শোনায় সেই জন্যে।

টুনি কাগজে নামগুলো লিখে নিল।

সেই রাতেই টুনি ছোটাচ্চুর ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেল। ই-মেইল এড্রেসটা টাইপ করে সে পাসওয়ার্ডের জায়গাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সেখানে ফাক্কু স্যারের ছেলে ফয়সলের নাম লিখে সেটাকে আট অক্ষর বানানোর জন্যে শেষে ওয়ান আর টু লিখে প্রথমবার চেষ্টা করে। টুনি ধরেই নিয়েছিল এখন লেখা হবে ভুল পাসওয়ার্ড, তখন সে আরেকটা কিছু লিখবে, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না–কিন্তু সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না,

যখন দেখল পাসওয়ার্ড সঠিক আর সে ফাক্কু স্যারের ই-মেইলের ভেতর ঢুকে গেছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!! তার মানে শান্ত ভাইয়া ঠিকই বলেছে। গাধা টাইপের মানুষেরা নিজের ছেলে-মেয়েদের নাম দিয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করে। টুনি দেখল তার সামনে ফাক্কু স্যারের কাছে পাঠানো সবগুলো ই-মেইল। কিছু কিছু ফাক্কু স্যার খুলে দেখেছে কিছু খুলে দেখেনি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সে একবারে পাসওয়ার্ডটা আন্দাজ করে ফেলতে পারবে স্বপ্নেও ভাবেনি। উত্তেজনায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হলো। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সে ল্যাপটপের মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নানান জায়গা থেকে নানা ধরনের ই-মেইল এসেছে, তার মাঝে হঠাৎ করে একটা ই-মেইলে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ই-মেইলের টাইটেল, 'ছাপানোর জন্যে গণিতের প্রশ্ন'।

যার অর্থ স্কুল যাদের কাছ থেকে প্রশ্ন ছাপিয়ে আনে তাদের কেউ একজন ফাক্কু স্যারের কাছে কোনো কারণে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছে। ফাক্কু স্যার প্রশ্নটা খুলে দেখেছে, কাজেই আরো একবার খুলে দেখলে কোনো ক্ষতি নেই। টুনি ই-মেইলটা খুলে পড়ল, প্রশ্ন টাইপ করতে গিয়ে কোনো একটা শব্দ পড়তে পারছে না, সেটা জিজ্ঞেস করে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছে এবং সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করে টুনির মাথায় ফাক্কু স্যারকে সঠিক শাস্তি দেওয়ার জন্যে চমৎকার একটা আইডিয়া হাজির হলো। আইডিয়াটা কাজ করতেও পারে আবার শেষ মুহূর্তে কচলেও যেতে পারে, কিন্তু পদ্ধতিটা খুবই নিরাপদ! যদি এবারে কাজ না করে ভবিষ্যতে আরো একবার অন্যভাবে চেষ্টা করতে পারবে, একজন মানুষের ই-মেইলের পাসওয়ার্ড জানা থাকলে অনেক কিছু করা যেতে পারে!

পরের কয়েক দিনে টুনি অনেক কষ্ট করে শান্তর স্কুলের অংক ম্যাডামের প্রশ্নটি টাইপ করে ফেলল। শান্ত আর শাপলা একই ক্লাশে পড়ে, কাজেই এই প্রশ্নটি শান্তর ক্লাশের উপযোগী হলে নিশ্চয়ই শাপলাদের ক্লাশেরও উপযোগী হবে। প্রশ্নটির শেষে সে অবশ্য একটি বাড়তি প্রশ্ন জুড়ে দিল, সব মিলিয়ে এগারোটি প্রশ্ন ছিল, তারটি হলো বারো নম্বর প্রশ্ন। তারপর টাইপ করা এই প্রশ্নটা সে যারা স্কুলের জন্যে প্রশ্ন ছাপায় তাদের কাছে পাঠিয়ে দিল। সাথে লিখে দিল—

AMARBOI.COM

আপনাদের যেহেতু হাতে লেখা প্রশ্ন টাইপ করতে সমস্যা হচ্ছে কাজেই আমি পুরোটা নিজেই টাইপ করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি এর মাঝে কোনো কিছু টাইপ করে ফেলে থাকেন তাহলে সেটা ব্যবহার না করে আমার টাইপ করা প্রশ্নটি ব্যবহার করুন। এখানে কোনো ভুল থাকবে না।

সহযোগিতার জন্যে

ধন্যবাদ

টুনি নিচে ফাক্কু স্যারের আসল নাম লিখে দিল।

যদি আসল ব্যাপারটা কেউ ধরতে না পারে তাহলে শাপলাদের অংক পরীক্ষার সময় ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়বে। তাদের ক্লাশের ছেলে-মেয়েরা সবাই অংক প্রশ্নের জন্যে এক হাজার করে টাকা দিয়ে রেখেছে, সে জন্যে তারা সাজেশন হিসেবে আসল প্রশ্নটা পেয়েও গেছে। সবাই সেগুলো মুখস্থ করে এসে পরীক্ষার হলে আবিষ্কার করবে সম্পূর্ণ নতুন প্রশ্ন। তখন ফাটাফাটি একটা মজা হলেও হতে পারে!

আর যদি আসল ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় তাহলে কিছু করার নেই, তখন নতুন করে একেবারে গোড়া থেকে আরেকবার শুরু করতে হবে। টুনির সময়ের অভাব নেই, মাথাতে বুদ্ধিরও অভাব নেই। আগে হোক পরে হোক ফাক্কু স্যারকে সে একদিন ধরবে। ধরবেই ধরবে।

দুই সপ্তাহ পর শাপলাদের ক্লাশে অংক পরীক্ষার দিন যা একটা ঘটনা ঘটল সেটা বলার মতো না। ছাত্রছাত্রীরা সবাই একধরনের ফুরফুরে মেজাজে পরীক্ষা দিতে বসেছে, অন্যান্য পরীক্ষায় পড়াশোনা করতে হয়—এই পরীক্ষায় কী আসবে সবাই জানে তাই বেশি লেখাপড়া করতে হয় না। ফাক্কু স্যারের বাসায় সবাই পরীক্ষার প্রশ্ন কয়েকবার প্র্যাকটিসও করে এসেছে।

প্রশ্নটা হাতে পাওয়ার পর সারা ক্লাশে প্রথমে একটা গুঞ্জন শুরু হলো তারপর দেখতে দেখতে হট্টগোল শুরু হলো। যেসব স্যার আর ম্যাডাম পরীক্ষায় গার্ড দিতে এসেছে তারা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

চুলে জেল দেয় এরকম গাট্টাগোট্টা একটা ছেলে—যে এর মাঝে শেভ করা শুরু করেছে—দাঁড়িয়ে বলল, "ভুল প্রশ্ন দিয়েছে। এই প্রশ্ন দেওয়ার কথা না!"

"ভুল প্রশ্ন? অন্য সাবজেক্টের?"

"না।"

"তাহলে অন্য ক্লাশের?"

"না।"

"তাহলে তোমরা কীভাবে জানো এটা ভুল প্রশ্ন?"

"আমরা জানি। এইটা ভুল প্রশ্ন।"

অন্য অনেকে তখন হইচই শুরু করল, টেবিলে থাবা দিতে লাগল, চিৎকার করতে লাগল। একজন মানুষ একা কখনো যে কাজটা করতে সাহস পায় না একসাথে অনেকে মিলে সেটা খুব সহজেই করে ফেলে। কাজেই সেকশানের প্রায় শ' দেড়েক ছেলেমেয়ে হঠাৎ করে একসাথে চেঁচামেচি শুরু করল। তারা টেবিলে থাবা দিয়ে লাফাতে শুরু করল, কাগজপত্র ছুঁড়ে মারতে লাগল, একজন জানালার একটা কাচ ভেঙে ফেলার পর আরো অনেকে জানালার কাচ ভাঙতে শুরু করল। স্কুলের অন্য স্যার-ম্যাডামেরা ছুটে এলো এবং তাদের সাথে ফাক্কু স্যারও হাজির হয়ে গেল।

প্রিন্সিপাল আতঙ্কিত দৃষ্টিতে হলঘর বোঝাই চিৎকার করতে থাকা লাফাতে থাকা, জিনিসপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকা, জানালার কাচ ভাঙতে থাকা ছেলে-মেয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে এখানে?"

একটু আগেই যে ছেলে-মেয়েরা শান্তশিষ্ট ছেলে-মেয়ে ছিল এখন তাদের ভিতর এড্রেনেলাইন হরমোন বের হতে শুরু করেছে, সবাই এখন ছোট ছোট একেকটি ইবলিশ। তারা প্রিন্সিপালের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিৎকার করতে থাকল, চেঁচামেচি করতে থাকল, দাপাদাপি করতে থাকল।

প্রিন্সিপাল আর অন্যান্য স্যার দুই হাত তুলে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করতে থাকল কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ফাক্কু স্যার একটা প্রশ্ন হাতে নিয়ে সেটার উপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠল। ঠিক তখন পিছন থেকে একটা ছাত্র তার প্রশ্নটা পাকিয়ে গোল করে ফাক্কু স্যারের দিকে

AMARBOI.COM

ছুঁড়ে দিল, সেটা পুরোপুরি লক্ষ্যভেদ করতে না পারলেও অন্যেরাও কিছুক্ষণের মাঝে তাদের প্রশ্ন গোল্লা পাকিয়ে ফাক্কু স্যারের দিকে ছুঁড়তে লাগল এবং কিছু কিছু একেবারে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে শুরু করল। বাড়াবাড়ি রকম রেগে যাওয়া একজন তার জ্যামিতি বাক্স ছুঁড়ে মারল, তখন অন্যেরাও উৎসাহ পেয়ে তাদের জ্যামিতি বাক্স ছুঁড়ে মারতে লাগল, তখন ঝনঝন শব্দে হলঘর কেঁপে উঠতে থাকে। ছেলে-মেয়েরা একটু পরেই তাদের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায়, তারপর হলঘরের মাঝে ছোটাছুটি করতে শুরু করে। স্যার-ম্যাডামেরা তখন ভয় পেয়ে এবারে ক্লাশ রুম থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? ব্যাপারটা কী? ছেলে-মেয়েগুলো এভাবে ক্ষেপে গেছে কেন?"

গার্ড দিতে আসা একজন স্যার বলল, "প্রশ্নটা পেয়েই ছেলে-মেয়েগুলো ক্ষেপে গেল। বলতে লাগল এটা তাদের প্রশ্ন না। এটা ভুল প্রশ্ন।"

"অন্য সাবজেক্টের প্রশ্ন?"

"না না, এটা গণিতেরই প্রশ্ন।"

"অন্য ক্লাশের প্রশ্ন?"

"না। তাদের ক্লাশেরই প্রশ্ন।"

"তাহলে তারা বুঝল কেমন করে এটা ভুল প্রশ্ন?"

"সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।"

কাছেই ফাক্কু স্যার একটা প্রশ্ন হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, তার চোখ-মুখ ফ্যাকাসে। প্রশ্নটা হাতে নিয়ে একটু পর পর ঢোঁক গিলছে, প্রিন্সিপাল তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এদের অংক টিচার না?"

ফাক্কু স্যার দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম জিজ্ঞেস করল, "আপনি প্রশ্ন করেছেন না?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে সমস্যাটা কী?"

"এইটা আসলে আমার প্রশ্ন না।"

"আপনার প্রশ্ন না?"

"না।"

AMARBOI.COM

"তাহলে কার প্রশ্ন?"

"সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"কেমন করে হলো?"

"যাদেরকে প্রশ্ন ছাপাতে দিয়েছি তারা ভুল করে অন্য স্কুলের প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছে।"

পাশে দাঁড়ানো একজন স্যার বলল, "প্রশ্নের উপর আমাদের স্কুলের নাম, ক্লাশ, পরীক্ষার তারিখ সব ঠিক আছে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ভুরু কুঁচকে ফাক্কু স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আমার সমস্যা অন্য জায়গায়। ছাত্রছাত্রীরা কেমন করে জানল এটা ভুল প্রশ্ন! এটা অন্য প্রশ্ন?"

ফাক্কু স্যার তার মাথা চুলকাতে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সরু চোখে ফাক্কু স্যারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ছেলে-মেয়েরা যদি বলত প্রশ্ন কঠিন হয়েছে, বুঝতে পারছে না তাহলে একটা কথা ছিল কিন্তু তা তো বলছে না। ছেলে-মেয়েরা বলছে ভুল প্রশ্ন! তার মানে একটা শুদ্ধ প্রশ্ন আছে। সেই শুদ্ধ প্রশ্নটার কথা তারা কেমন করে জানল?"

ফাক্কু স্যার ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে লাগল। এবারেও কোনো উত্তর দিল না।

হলঘরের ভেতর তখন তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে এবং বাইরে থেকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যেতে লাগল। কম বয়সী একজন শিক্ষক বলল, "মনে হয় পুলিশ ডাকতে হবে।"

আরেকজন বলল, "পুলিশে হবে না। মিলিটারি ডাকতে হবে।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বলল, "এটা চলতে দেওয়া যাবে না। এদের থামাতে হবে।"

কমবয়সী শিক্ষক বলল, "কেমন করে থামাব? উঁচু ক্লাশের ছেলে-মেয়ে, বড় হয়ে গেছে। এরা এখন রীতিমতো মব। মব খুব ভয়ঙ্কর।"

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম বলল, "জানি। কিন্তু এভাবে তো উচ্ছৃঙ্খল হতে দেওয়া যাবে না। ভিতরে ঢুকতে হবে। আসেন সবাই আমার সাথে।"

সবাই তখন আবার হলঘরে গিয়ে ঢুকল এবং তাদের দেখে ছেলে-মেয়েরা আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। তাদের চিৎকার-হইচই এবারে

AMARBOI.COM

আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম খামোখাই তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, কোনো লাভ হলো না।

পুরো হলঘরে শুধুমাত্র শাপলা তার সিটে চুপচাপ বসে ছিল। শুধু যে বসে ছিল তা না, এই ভয়ঙ্কর হইচই-চেঁচামেচি-গোলমালের মাঝে একটা প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত লিখে ফেলেছে। এইবারে সে খাতা বন্ধ করে তার সিট থেকে উঠে হলঘরের প্রিন্সিপালের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল, "ম্যাডাম আমি একটু চেষ্টা করে দেখব এদের শান্ত করা যায় কি না?"

"তুমি? পারবে?"

"চেষ্টা করে দেখি?"

"ঠিক আছে দেখো।"

শাপলা তখন লাফ দিয়ে হলঘরের সামনে রাখা টেবিলের উপর উঠে গেল, তারপর দুই হাত উপরে তুলে নাড়াতে শুরু করে।

ছেলে-মেয়েদের শান্ত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এবারে তারা শাপলার দিকে হাতের কাছে যা পাওয়া গেল সেটা ছুঁড়তে শুরু করল। শাপলা সাবধানে নিজেকে রক্ষা করতে করতে চেঁচাতে লাগল, "বারো নম্বর, বারো নম্বর, বারো নম্বর!"

তার চিৎকার শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল, ছাত্রছাত্রীরা একটু শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "বারো নম্বর কী?"

"তোরা কি বারো নম্বর প্রশ্নটা দেখেছিস?"

ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নটা হাতে পেয়েই ক্ষেপে উঠেছিল, পুরোটা পড়ে দেখার সময় পায় নাই। এবারে তারা বারো নম্বর প্রশ্নটা দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের কারো হাতেই প্রশ্ন নেই, সবাই প্রশ্নটা গোল্লা বানিয়ে তারা ফাক্কু স্যারের দিকে ছুঁড়ে মারতে চেষ্টা করেছিল। শাপলা বলল, "আমার কাছে প্রশ্নটা আছে। তোদের পড়ে শোনাই?"

ছাত্রছাত্রীরা এবারে পুরোপুরি শান্ত হয়ে বারো নম্বর প্রশ্নটা শোনার জন্যে শাপলার দিকে তাকিয়ে থাকে। শাপলা তখন টুনির নিজের থেকে লেখা বারো নম্বর প্রশ্নটা পড়ে শোনাতে শুরু করে। সে বলল, "এই প্রশ্নটা সোজা, তোরা সবাই এর উত্তর দিতে পারবি। প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম : জনৈক দুর্নীতিবাজ শিক্ষক তার কাছে প্রাইভেট না পড়লে

ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়। ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়ার জন্যে এই শিক্ষক প্রতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে এক হাজার করে টাকা নিয়েছে, ক্লাশে সর্বমোট একশ' পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী থাকলে ফাইনাল পরীক্ষা উপলক্ষে এই দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের কত টাকা উপার্জন হয়েছে?"

হলঘরের সব ছাত্রছাত্রী আবার একসাথে চিৎকার করে উঠল। শাপলা হাত তুলে তাদের থামানোর চেষ্টা করতে থাকে, এবারে ছাত্রছাত্রীরা বেশ সহজেই থেমে গেল। শাপলা বলল, "তোরা যদি সবাই মিলে চিৎকার করিস তাহলে কোনো লাভ হবে না। যদি স্যার-ম্যাডামদের সাথে কথা বলতে চাস, একজন দাঁড়িয়ে কথা বল। একজন। সবাই না। শুধু একজন।"

মোটাসোটা একটা মেয়ে বলল, "তুই-ই বল আমাদের হয়ে।"

শাপলা বলল, "আমি অংক স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ি না, সেই জন্যে আমি কিছু জানি না। এই প্রশ্নটা তো আমার কাছে ভালোই লাগছে। বারো নম্বরটা তো মুখে মুখে করা যায়। দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন হয়েছে।"

হলঘরের সব ছেলে-মেয়ে একসাথে হেসে উঠল, ভয়ঙ্কর এক ধরনের হাসি, শুনলে আত্মা শুকিয়ে যায়। শাপলা হাত তুলতেই আবার সবাই থেমে গেল। শাপলা বলল, "ভিতরের ব্যাপার আমি কিছু জানি না, জানলে আমি বলতাম। তোরা কেউ একজন বল।"

তখন চশমা পরা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি বলব।"

শাপলা বলল, "ভেরি গুড।" তারপর টেবিল থেকে নিচে নেমে প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডামকে বলল, "ম্যাডাম, আপনি এখন এদের মুখ থেকে শুনেন।"

সবাই শান্ত হয়েছে, হইচই, দাপাদাপি, চিৎকার-চেঁচামেচি থেমেছে, তাই প্রিন্সিপাল ম্যাডামের একটু সাহস ফিরে এলো। দুই পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "বলো ছেলে কী বলবে।"

চশমা পরা ছেলেটা গলা পরিষ্কার করে বলল, "আমরা সবাই ঠিকভাবে লেখাপড়া করতে চাই। আমরা টাকা দিয়ে প্রশ্ন কিনে পরীক্ষা

AMARBOI.COM

দিতে চাই না। প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে চাই না। কিন্তু আমাদের অংক স্যার আমাদের সেটা করতে বাধ্য করেছেন। ক্লাশের সবাইকে তার কাছে প্রাইভেট পড়তে হয়। যারা তার কাছে প্রাইভেট পড়ে না, স্যার তাদেরকে ফেল করিয়ে দেন। আমাদের ক্লাশে শুধু শাপলা অংক স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে না—শুধু শাপলার সাহস আছে আমাদের নাই। আমাদের আব্বু-আম্মুরা ভয় পায়। প্রাইভেট পড়ে না বলে শাপলার কত যন্ত্রণা হয় আপনারা সেইটা জানেন না। ক্লাশে স্যার সব সময় শাপলাকে অপমান করেন, শাস্তি দেন। শাপলা আমাদের ক্লাশে সবচেয়ে ভালো গণিত জানে, গণিত অলিম্পিয়াডে মেডেল পায়—ক্লাশের পরীক্ষায় স্যার সব সময় তাকে গোল্লা দেন। শাপলা সেটা সহ্য করে। কাউকে কিছু বলে না।"

ছেলেটা একটু দম নিয়ে বলল, "প্রত্যেক পরীক্ষার আগে স্যারকে সাজেশনের জন্যে টাকা দিতে হয়। নামে সাজেশন, আসলে স্যার পুরো প্রশ্নটা বলে দেন। আমরা সেই প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষা দেই। পরীক্ষায় সবাই এ প্লাস পাই। কেউ কোনো গণিত শিখি না।

"এইবারও ফাইনাল পরীক্ষার আগে স্যার সবার কাছে এক হাজার করে টাকা চেয়েছেন, আমরা টাকা দিয়েছি। যাদের টাকা-পয়সার টানাটানি তাদের আব্বু-আম্মু ধার-কর্জ করে টাকা দিয়েছে। সেই টাকা নিয়ে স্যার অংক পরীক্ষার সাজেশন দিয়েছেন। আমরা সবাই সেই সাজেশন মুখস্থ করে এসেছি। এসে দেখি অন্য প্রশ্ন! সেটা দেখে সবার মাথা গরম হয়ে গেছে।"

হলঘরের অন্যান্যরাও তখন একসাথে কথা বলতে শুরু করল, আগের মতো হইচই করে নয়, শান্তভাবে। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তখন হাত তুলে তাদের শান্ত করে একজন একজন করে সবার কথা শুনল। সবার বক্তব্য মোটামুটি একরকম। কথা বলতে বলতে কয়েকজনের গলা ভেঙে গেল। কয়েকজন হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, তারপর হলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি দেখছি কী করা যায়। তোমরা আজকে বাসায় যাও। আজকের পরীক্ষাটা অন্য একদিন নেওয়া হবে।"

ছাত্রছাত্রীরা বের হবার সময় লক্ষ করল, টেলিভিশনের ক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকেরা চলে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি তারা কেমন করে খবর পেল?

এক সপ্তাহ পর দেখা গেল স্কুলের কোনায় গাছের ছায়ায় ঢাকা সিঁড়িতে শাপলা আর টুনি বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে। আজকাল টুনিও শাপলার মতো কায়দা করে সিগারেট খাওয়া শিখে গেছে। সিগারেট খেতে খেতে দুইজন হেসে কুটি কুটি হচ্ছে, শাপলা টুনির পিঠে থাবা দিয়ে বলল, বুঝলি টুনি, তোকে একটা গোল্ড মেডেল দিব ঠিক করেছি। চব্বিশ ক্যারটের খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি দশ ভরি সোনার মেডেল।"

টুনি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "কখন দিবে শাপলা আপু?"

"এখনই দিব। সাথে নিয়ে এসেছি। যে ফাক্কু স্যারকে স্কুল থেকে বিদায় করতে পারে তাকে এর চাইতে বড় মেডেল দেওয়া দরকার।"

টুনি বলল, "দশ ভরি মেডেল অনেক বড়। এর চাইতে বড় দরকার নেই শাপলা আপু।"

"ঠিক আছে।" বলে শাপলা তার পকেট থেকে চব্বিশ ক্যারটের দশ ভরি ওজনের সোনার মেডেলটা বের করে টুনির গলায় পরিয়ে দিল। টুনি মেডেলটা দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

সিগারেটের মতো মেডেলটাও মিছিমিছি—তাতে কী আছে? আনন্দটা তো মিছিমিছি নয়। আনন্দটা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি!

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু সোফায় দুই পা তুলে বসে একটা বই পড়ছে—কিংবা ঠিক করে বললে বলা উচিত একটা বই পড়ার চেষ্টা করছে। তার কাছাকাছি মেঝেতে বসে এই বাসার বাচ্চারা মিলে কিছু একটা খেলছে। খেলাটা লুডু হতে পারত কিন্তু লুডু খেলায় একজনের সাথে আরেকজনের হাতাহাতি হবার কথা না কিন্তু এখানে প্রচণ্ড হাতাহাতি হচ্ছে। মাঝে মাঝেই লুডুর বোর্ড কিংবা ঘুঁটি উড়ে যাচ্ছে কিন্তু সেজন্যে খেলার কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রত্যেকবার ছক্কা পড়ার পর সবাই মিলে যেভাবে চিৎকার করছে সেটা শুনে মনে হতে পারে কেউ একজন ওয়ার্ল্ড কাপ খেলায় পেনাল্টি কিক করে গোল দিয়ে ফেলেছে।

ছোটাচ্চু বই পড়ায় খুব বেশি এগুতে পারছিল না, বাচ্চারা আবার একটা কান ফাটানো চিৎকার করার পর ছোটাচ্চু ধমক দিয়ে বলল, "তোরা কী শুরু করেছিস?"

একজন বলল, "খেলছি ছোটাচ্চু।"

"এইটা খেলার নমুনা! এরকম ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?"

আরেকজন বলল, "ষাঁড় কখনো চেঁচায় না। ষাঁড় ডাকে।" তারপর ষাঁড় কেমন করে ডাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা করল। সেটা শুনে সব বাচ্চারা হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ঠিক তখন ছোটাচ্চুর টেলিফোনটা বাজল, এই হট্টগোলে টেলিফোনে কথা বলা যাবে না জেনেও ছোটাচ্চু সেটা ধরল, "হ্যালো।"

"এটা কি ডিটেকটিভ অফিস?"

"জি এটা আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস।" কথা ভালো করে শোনার জন্যে ছোটাচ্চু হাত দিয়ে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করল, কোনো লাভ হলো না।

AMARBOI.COM

টেলিফোনের অন্য পাশ থেকে বলল, "আমি মাহী কাঞ্চন বলছি।"

ছোটাচ্চু বলল, "কী বললেন? মাহী কাঞ্চন?"

একমুহূর্তে বাচ্চাগুলো পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে গেল। তাদের চোখ বড় হয়ে যায় এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ফিসফিস করে তারা উচ্চারণ করল, "মা—হী—কা—ঞ্চ—ন?" তারপর সবাই লাফ দিয়ে উঠে ছোটাচ্চুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। ছোটাচ্চু এবং অন্য পাশ থেকে মাহী কাঞ্চন কী বলে শোনার জন্যে সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। মাহী কাঞ্চন এই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক। তার গান শুনলে কম বয়সী মেয়েদের হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। কয়েক মাস আগে তার একটা অটোগ্রাফের জন্যে ভক্তদের ভেতর এত মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছিল যে পুলিশের লাঠিচার্জ করে থামাতে হয়েছিল। মাহী কাঞ্চনের কনসার্টের ঘোষণা হওয়ার দশ মিনিটের ভেতর সব টিকেট বিক্রি হয়ে যায়। জোছনা রাতে তার গান শুনে পুরোপুরি মাথা আউলে গিয়েছে এরকম অনেক মানুষ আছে। সেই মাহী কাঞ্চন নিজে ছোটাচ্চুকে ফোন করেছে। সেটা নিজের কানে শুনেও বাচ্চাদের বিশ্বাস হতে চায় না। মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুকে কী বলছে সেটা শোনার জন্যে বাচ্চারা ছোটাচ্চুর কানের কাছে নিজেদের কান লাগানোর জন্যে নিঃশব্দে নিজেদের ভেতর ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল।

টেলিফোনের অন্য পাশ থেকে মাহী কাঞ্চন বলল, "আমি গান গাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "সেটা আপনাকে বলতে হবে না, আমরা সবাই জানি। মাহী কাঞ্চনকে দেশের সবাই চিনে।"

মাহী কাঞ্চন বলল, "আমি একটা বিশেষ দরকারে আপনাকে ফোন করেছি।"

"কী দরকার?"

"আপনার তো একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে, তাই না?"

"জি, আছে।"

"আপনার এজেন্সির সাথে আমার একটু কথা বলার দরকার।"

ছোটাচ্চুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল, তার টেলিফোনের সাথে কান লাগিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে যারা মাহী কাঞ্চনের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল তাদের চোখও বড় বড় হয়ে গেল।

ছোটাচ্চু বলল, "আমার এজেন্সির সাথে দেখা করবেন?"

"হ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কী, আমি গোপনে দেখা করতে চাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা সব রকম গোপনীয়তা বজায় রাখি। আমার ক্লায়েন্টদের কথা কেউ জানে না। পুরোপুরি গোপন।"

মাহী কাঞ্চন বলল, "আমার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। আমি ডিটেকটিভ এজেন্সির সাথে দেখা করেছি কথাটা জানাজানি হলে ফেসবুকে তুলকালাম হয়ে যাবে। সেখান থেকে পত্র-পত্রিকা, টিভি চ্যানেল সব জায়গায় হইচই শুরু হয়ে যাবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি জানি। আপনার মতো সেলিব্রেটিদের সবসময় খুব সাবধান থাকতে হয়।"

"মিডিয়া জান খেয়ে ফেলে। তাই খুব গোপনে আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই।"

"ঠিক আছে। কীভাবে কথা বলতে চান?"

"টেলিফোনে বলা যাবে না। সামনাসামনি বলতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় আপনাদের অফিসে কথা না বলে গোপনে যদি আপনার বাসায় দেখা করতে পারি।"

মাহী কাঞ্চন বাসায় চলে আসতে চায় শুনে বাচ্চারা নিঃশব্দে আনন্দে চিৎকার করার ভঙ্গি করতে লাগল। এখনো তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না মাহী কাঞ্চন নিজে ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলছে!

ছোটাচ্চু বলল, "কোনো সমস্যা নেই। আপনি কখন আমার বাসায় আসতে চান?" তার যে আসলে কোনো অফিস নেই, দেখা করতে হলে যে বাসাতেই দেখা করতে হবে সেই কথাটা আর বলল না।

মাহী কাঞ্চন বলল, "এখনই।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "এখনই?" সেটা শুনে সব বাচ্চার প্রায় হার্টফেল করার মতো অবস্থা হলো, তারা নিঃশব্দে দাপাদাপি করতে থাকে।

AMARBOI.COM

মাহী কাঞ্চন বলল, "হ্যাঁ, এখনই।"

"ঠিক আছে।"

"আমি একা আসব। কাউকে না জানিয়ে।"

"ঠিক আছে।"

"আমাকে সিকিউরিটি দেবার জন্যে লোকজন থাকে, খুব বিরক্ত করে। তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে আসব।"

"ঠিক আছে।"

"আপনার বাসার ঠিকানাটা দেন।"

ছোটাচ্চু বাসার ঠিকানা দিয়ে টেলিফোনটা রাখার পর বাচ্চারা প্রথমবার তাদের বুকের ভিতর আটকে রাখা কথাগুলো গগনবিদারি চিৎকার হিসেবে বের করল। সেই ভয়াবহ চিৎকার শুনে তিনতলা থেকে বড় ভাই, দুইতলা থেকে দাদি এবং মেজ ভাবি, চারতলা থেকে ঝুমু খালা আর ছোট ভাবি ছুটতে ছুটতে চলে এলো। কোনো অঘটন ঘটেনি, মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুর সাথে দেখা করতে এসেছে শোনার পর তারা শান্ত হলো, কিন্তু তারাও বাচ্চাদের থেকে কম অবাক হলো না।

ছোটাচ্চু তাড়াতাড়ি গিয়ে শেভ করল, একটা জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরল। বাচ্চারা তার ঘরটা পরিষ্কার করে দিল। মাহী কাঞ্চন কোথায় বসে ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলবে কেউ জানে না, তাই তারা বাইরের ঘরটাও পরিষ্কার করে দিল। মেহমানকে কী খেতে দিবে সেটা ঝুমু খালা কয়েকবার জিজ্ঞেস করে জেনে নিল, তারপর ঝাঁটা নিয়ে বাইরে গিয়ে পুরো সিঁড়িটা ঝাড়ু দিয়ে দিল।

তারপর বাচ্চারা সবাই জানালায় মুখ লাগিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। প্রত্যেকবার একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে আসে তারা তখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, গাড়িটা যখন বাসার সামনে না থেমে এগিয়ে যায় তখন সবাই একসাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ঘণ্টাখানেক পর বাচ্চারা যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছে তখন বাসার সামনে একটা স্কুটার এসে থামল। মাহী কাঞ্চনের মতো এত বড় একজন গায়ক তো আর স্কুটারে করে আসবে না তাই তারা স্কুটারটাকে কোনো গুরুত্ব দিল না, একটা গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। যদি গুরুত্ব দিত তাহলে দেখত স্কুটার থেকে মাহী কাঞ্চন নেমে এদিক-সেদিক তাকিয়ে তাদের বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকে গেছে।

AMARBOI.COM

মাহী কাঞ্চন যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে তখন বাচ্চারা সবাই দেখল বড় একটা সাদা গাড়ি তাদের বাসার কাছাকাছি এসে থেমেছে। তারা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে এটা নিশ্চয়ই মাহী কাঞ্চনের গাড়ি কিন্তু দেখল গাড়ি থেকে কেউ নামল না। দেখা যাচ্ছে গাড়ির ভেতরে কেউ বসে আছে কিন্তু কেউই সেখান থেকে নামছে না। বিষয়টা যথেষ্ট সন্দেহজনক কিন্তু ঠিক তখন তাদের কলিংবেল বেজে উঠল। বাচ্চারা সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল, তারপর একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে ছুটে যায়। সবাই মিলে একে অন্যকে ঠেলে দরজার ছিটকানি খুলে দিল। দেখল দরজার বাইরে মাহী কাঞ্চন দাঁড়িয়ে আছে।

বাচ্চারা ঠিক করে রেখেছিল তারা মাহী কাঞ্চনকে দেখে কোনো বাড়াবাড়ি করবে না, তাই কেউ বাড়াবাড়ি করল না, শুধু চোখ বড় বড় করে সবাই নিঃশব্দে মাহী কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন তারা একটা জীন, পরী কিংবা ভূতের দিকে তাকিয়ে আছে। এভাবে কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রীমি নিজেকে সামলাতে পারল না। সে হঠাৎ "ই—ই—ই—ই—" করে একটা চিৎকার করে উঠল এবং সেটা একটা চেইন রি-একশান শুরু করার মতো কাজ করল। তখন একসাথে সবাই "ই—ই—ই—ই—" করে চিৎকার করে ওঠে। সেই চিৎকার এত বিকট যে মনে হলো বাসার ছাদ ধসে পড়বে কিন্তু মাহী কাঞ্চন ঘাবড়ে গেল না, চোখ বড় বড় করে শান্ত মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হয় আগেও অনেকবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

বাচ্চারা কতক্ষণ চিৎকার করত জানা নেই, ছোটাচ্চু তাদের ধমক দিয়ে থামানোর চেষ্টা করল, বলল, "এই তোরা থামবি? কী শুরু করেছিস পাগলের মতো।" তারপর মাহী কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসেন। আপনি ভিতরে আসেন।"

মাহী কাঞ্চন ভিতরে না ঢুকে ভুরু কুঁচকে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "আপনি ডিটেকটিভ?"

"জি।"

"আপনাকে দেখে মনে হয় ক্লাশ টেনে পড়েন।"

মাহী কাঞ্চনের কথা শুনে বাচ্চারা হি হি করে হেসে উঠল, ছোটাচ্চুর কান একটু লাল হয়ে উঠল, তারপরও মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল, "না আমি ক্লাশ টেনে পড়ি না। গত বছর মাস্টার্স পাস করেছি।"

মাহী কাঞ্চন বলল, "আমি ভেবেছিলাম প্রাইভেট ডিটেকটিভরা বুড়ো হয়। চোখে বাই ফোকাল চশমা পরে, চুরুট না হলে পাইপ খায়।"

শান্ত বলল, "ছোটাচ্চুর একটা জিরো পাওয়ারের চশমা আছে। যখন বয়স্ক দেখাতে চায় তখন সেটা চোখে দেয়।"

টুম্পা বলল, "একটা টাইও আছে। লাল রঙের।"

শান্ত বলল, "কিন্তু টাইয়ের নট বাঁধতে পারে না। তাই সেটা সব সময় নট বাঁধা থাকে। তাই না ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "তোরা চুপ করবি?"

মাহী কাঞ্চন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ছোটাচ্চু কে?"

ছোটাচ্চু একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "আমি।"

"আপনার ছেলে-মেয়েরা আপনাকে বাবা না ডেকে ছোটাচ্চু ডাকে কেন?"

ছোটাচ্চু লাল হয়ে বলল, "এরা আমার ছেলে-মেয়ে না। এরা আমার ভাই-বোনের ছেলে-মেয়ে।"

মাহী কাঞ্চন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সেরকমভাবে কয়েকবার মাথা নাড়ল, তারপর আবার তার ভুরু কুঁচকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু তাহলে তো আপনাকে চাচা কিংবা মামা ডাকবে। ছোটাচ্চু ডাকে কেন?"

প্রমি উত্তর দিল, বলল, "আমরা ছোট চাচ্চুকে শর্টকাট করে ছোটাচ্চু বলি।"

"আর যাদের ছোট মামা?"

"তারাও ছোটাচ্চু বলি।"

শান্ত ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে দিল, বলল, "ছোটাচ্চুর যখন বিয়ে হবে আর যখন ছেলে-মেয়ে হবে তখন তারাও ছোটাচ্চুকে আব্বু না ডেকে ছোটাচ্চু ডাকবে। তাই না রে?"

AMARBOI.COM

বাচ্চারা সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। টুম্পা বলল, "আমরা সবাই একসাথে থাকি। তাই যে যেটা ডাকে আমরাও সেটা ডাকি। চাচাকে মামা ডাকি, দাদিকে নানি ডাকি, চাচিকে ভাবি ডাকি, খালাকে আপু ডাকি—"

মাহী কাঞ্চন এবারে পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল, অবাক হয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে রইল। টুনি এই জটিল আলাপটা থামানোর জন্যে বলল, "আপনি ভিতরে আসবেন না?"

"আসব?"

সব বাচ্চারা চিৎকার করে উঠল, "হ্যাঁ", তারপর দরজা থেকে সরে তাকে ভেতরে ঢোকার জায়গা করে দিল।

মাহী কাঞ্চন কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল, ঢুকে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল কিন্তু সব সময়েই বাচ্চাদের দিকে একটা চোখ রাখল।

ছোটাচ্চু বলল, "বসেন।"

মাহী কাঞ্চন কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলল, "বসব?"

ছোটাচ্চু কিছু বলার আগেই বাচ্চারা চিৎকার করে বলল, "বসেন।"

AMARBOI.COM

মাহী কাঞ্চন সাবধানে একটা সোফায় বসল। বাচ্চারা তাকে ঘিরে এগিয়ে আসে, মাহী কাঞ্চন কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু তাদেরকে বলল, "তোরা এখন যা। আমাদের এখন জরুরি কথা আছে।"

টুম্পা বলল, "আমরা বসে থাকি? একটুও ডিস্টার্ব করব না।"

ছোটাচ্চু গলা উঁচিয়ে বলল, "না। ভাগ এখান থেকে। ভাগ।"

"একটু থাকি?"

"না। একটুও না। ভাগ।"

বাচ্চারা মনমরা হয়ে বের হতে থাকে। টুম্পা দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মাহী কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আপনাকে একটু ছুঁয়ে দেখি?"

মাহী কাঞ্চন কেমন যেন চমকে উঠল, বলল, "ছুঁয়ে দেখবে? আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"গায়কেরা কী রকম হয় দেখতাম। টিপে দেখতাম।"

"টিপে দেখতে?"

ছোটাচ্চু বলল, "না টিপে দেখতে হবে না। একজন মানুষকে আবার টিপে দেখে কেমন করে? যা, ভাগ এখান থেকে।"

"তাহলে ছুঁয়ে দেখি!"

মাহী কাঞ্চন কিছু বলার আগেই ছোটাচ্চু বলল, "না ছুঁয়েও দেখতে হবে না। যা তোরা, আমাদের কথা বলতে দে।"

টুম্পা মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "এই একটুখানি। প্লিজ।"

মাহী কাঞ্চন ভয়ে ভয়ে তার ডান হাতটা টুম্পার দিকে বাড়িয়ে দিল, তখন টুম্পার সাথে সাথে অন্য সবাইও তার হাতটাকে খাবলে ধরল। ছোটাচ্চুকে রীতিমতো যুদ্ধ করে তাদের হাত থেকে মাহী কাঞ্চনের হাতকে ছুটিয়ে আনতে হলো। ছোটাচ্চু তারপর সবাইকে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ওহ! এই বাচ্চা-কাচ্চাদের যন্ত্রণায় জীবন শেষ। সবগুলো একটা করে ইবলিশ।"

মাহী কাঞ্চন ভয়ে ভয়ে তার মুক্ত করে আনা হাতটাকে পরীক্ষা করে বলল, "কাজটা ঠিক করলাম কি না বুঝতে পারছি না।"

"কোন কাজটা?"

"এই যে হঠাৎ করে চলে এসেছি। আমি ভেবেছিলাম মোটাসোটা বয়স্ক একজন ডিটেকটিভ হবে, কিন্তু আপনি এত বাচ্চা!"

ছোটাচ্চু মুখ গম্ভীর করে বলল, "বয়সটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। আমার বয়স কম হতে পারে কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অনেক। আমি অনেক কেস সলভ করেছি। টেলিভিশনে সেটা নিয়ে নিউজ পর্যন্ত করেছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা পুরস্কারও পেয়েছি।"

মাহী কাঞ্চন বলল, "জানি। সেই জন্যেই এসেছি। কিন্তু ভাবছিলাম আপনি আরো মোটা হবেন। মোটা আর বয়স্ক।"

ছোটাচ্চু এই প্রথম আরো মোটা না হওয়ার জন্যে একটুখানি হতাশা অনুভব করল কিন্তু কী বলবে বুঝতে পারল না। মাহী কাঞ্চন বলল, "কোনো মানুষের সাথে কথা বললেই আমার মাথায় তার একটা চেহারা ভেসে ওঠে, যদি সেই চেহারার সাথে তার আসল চেহারা না মিলে তখন খুব অস্থির লাগে।"

ছোটাচ্চু দেখল আসলেই মাহী কাঞ্চনকে বেশ অস্থির লাগছে। ভয়ে ভয়ে বলল, "ফ্যানটা ছেড়ে দেব?"

"না। ফ্যান ছাড়তে হবে না।" মাহী কাঞ্চন সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। মনে হলো মাথার মাঝে বয়স্ক এবং মোটা ছোটাচ্চুর চেহারাটা সরিয়ে তার নূতন চেহারাটা ঢোকানোর চেষ্টা করছে। ছোটাচ্চু কী করবে বুঝতে না পেরে পাশে চুপচাপ বসে রইল। ঠিক তখন বন্ধ করে রাখা দরজাটায় শব্দ হলো এবং মাহী কাঞ্চন চমকে উঠে চোখ খুলে বলল, "কে? কী? কী হয়েছে?"

ছোটাচ্চু বলল, "কিছু না। মনে হয় আমাদের জন্যে চা এনেছে।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল, সত্যি সত্যি ঝুমু খালা একটা ট্রেতে চা এবং তার সাথে নানা রকম খাবার নিয়ে এসেছে। ঝুমু খালা ভেতরে ঢুকে টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে রাখে, মাহী কাঞ্চন কেমন যেন ভয় পাওয়া চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে, "চা-নাস্তা কেন? আমি চা-নাস্তা খাই না।"

ঝুমু খালা কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে বলল, "আপনি খান না বললেই হবে নাকি? আপনাকে খেতে হবে।"

"কেন? কেন আমাকে খেতে হবে?" মাহী কাঞ্চন কেমন জানি একটু ভয় পেয়ে যায়।

"আমার ডাইল পুরি দুনিয়ার মাঝে ফার্স্ট ক্লাশ। আমরিকার প্রেসিডেন্ট বারেক মিয়া যদি একবার খায়—"

ছোটাচ্চু বলল, "বারেক মিয়া না। বারাক ওবামা।"

"একই কথা। যদি খায় তাহলে আমারে নোবেল পুরস্কার দিব।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক আছে ঝুমু। তুমি যাও। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নোবেল পুরস্কার দেয় না। ডাল পুরি বানানোর জন্যে নোবেল পুরস্কার নাই।"

ঝুমু খালা বলল, "একই কথা।" তারপর তেজি ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মাহী কাঞ্চন একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনাদের পরিবারের মানুষজন একটু অন্য রকম।"

অন্য রকম মানে ভালো না খারাপ ছোটাচ্চু বুঝতে পারল না বলে কোনো কথা বলল না।

মাহী কাঞ্চন বলল, "আপনাকে বলি আমি কেন এসেছি।"

"বলেন।"

মাহী কাঞ্চন এদিক-সেদিক তাকাল তারপর গলা নামিয়ে বলল, "কেউ একজন আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছে।"

ছোটাচ্চু চমকে উঠে বলল, "কিডন্যাপ? আপনাকে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি যেখানেই যাই—আমার মনে হয়—"

"কী মনে হয়?"

"মনে হয় একটা সাদা গাড়ি আমার পিছু পিছু যায়।"

"আপনি আপনার ফ্যামিলির লোকজনকে বলেননি?"

মাহী কাঞ্চন কেমন যেন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "বলেছি। লাভ হয় নাই। সে জন্যেই তো আপনার কাছে গোপনে আসতে হলো।"

ছোটাচ্চু বলল, "কিন্তু আপনার ফ্যামিলিকে বলে লাভ হলো না কেন?"

"তারা আমার কথাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না।"

"আপনি এত বড় গায়ক। আপনাকে দেখলে একটা আস্ত জেনারেশান পাগল হয়ে যায়। আর আপনার ফ্যামিলি আপনাকে গুরুত্ব দেয় না এটা কেমন কথা! কেন গুরুত্ব দেয় না?"

মাহী কাঞ্চন কেমন যেন মাছের মতো চোখের পাতি না ফেলে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "কারণ আছে।"

"কী কারণ?"

AMARBOI.COM

"বলা যাবে না।"

ছোটাচ্চু থতমত খেয়ে বলল, "ও।"

ঘরের ভেতরে যখন ছোটাচ্চু আর মাহী কাঞ্চন কথা বলছে ঠিক তখন টুনি খুব সাবধানে দরজায় কান পেতে ভিতরে কী আলাপ হচ্ছে শোনার চেষ্টা করছিল। পরিষ্কার শোনা না গেলেও টুনি দরকারি কথাগুলো শুনে ফেলল, মাহী কাঞ্চনকে একটা সাদা গাড়ি অনুসরণ করে, সেই সাদা গাড়ির লোকজন মাহী কাঞ্চনকে কিডন্যাপ করবে। টুনির সারা শরীর শিউরে উঠল, কারণ তারা সবাই যখন জানালায় মুখ লাগিয়ে মাহী কাঞ্চনের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিল তখন সে দেখেছে একটা সাদা গাড়ি এসে তাদের বাসার সামনে থেমেছে। সেই গাড়ি থেকে কেউ নামেনি, গাড়িতে অপেক্ষা করছে। মনে হয় তারা মাহী কাঞ্চনকে কিডন্যাপ করবে। আজকে। এখানে। একটু পরে। টুনির গলা শুকিয়ে গেল। সে এখন কী করবে? ছোটাচ্চুকে বলবে? ছোটাচ্চু কি তার কথা বিশ্বাস করবে?

ঠিক তখন শান্ত এদিক দিয়ে হেঁটে আসছিল, টুনিকে দেখে থেমে গেল। বলল, "তোর কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ হয়েছে।"

শান্ত ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী সর্বনাশ হয়েছে?"

"মাহী কাঞ্চন কেন এসেছে জানো?"

"কেন?"

"তাকে কিডন্যাপ করে নিবে, সেটা ছোটাচ্চুকে বলার জন্যে।"

"কে কিডন্যাপ করে নিবে?"

"একটা সাদা গাড়িতে করে এসে অনেকগুলো ক্রিমিনাল।"

শান্ত ভুরু কুঁচকে বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি দরজার মাঝে কান লাগিয়ে কথা শুনছিলাম।"

শান্ত হাল ছেড়ে দেবার মতো ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, তারপর বলল, "পুলিশকে বলে না কেন? তাহলেই তো পুলিশ পাহারা দিবে। মাহী কাঞ্চনের ভয় কী? সে কত বিখ্যাত জানিস?"

"জানি।"

AMARBOI.COM

"তুই না ডিটেকটিভ! এই একটা কথা শুনে তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন?"

টুনি বলল, "আমি কেন ভয় পেয়েছি শুনবে?"

"কেন?"

"মাহী কাঞ্চন যে সাদা গাড়িটার কথা বলেছে সেই সাদা গাড়িটা এখন আমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে!"

শান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললি?"

"মনে নাই একটা গাড়ি এসে থামল—"

"কিন্তু—"

টুনি বলল, "কলিংবেলের শব্দ শুনে তোমরা সবাই চলে গেলে, আমি একটু পরে গিয়েছি, আমি দেখেছি কেউ নামে নাই গাড়ি থেকে। সবাই গাড়িতে বসে আছে।"

"সত্যি?"

টুনি বলল, "হ্যাঁ সত্যি। আমার কথা বিশ্বাস না করলে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো।"

শান্ত টুনির সাথে শোয়ার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল সত্যি সত্যি বাসার সামনে একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে পুরো দেখা যায় না কিন্তু বোঝা যায় গাড়ির ভিতরে কয়েকজন চুপ করে বসে আছে। মাহী কাঞ্চন বের হলেই মনে হয় তাকে জাপটে ধরে গাড়িতে তুলে নেবে।

টুনি বলল, "বিশ্বাস হলো?"

শান্ত বলল, "দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।"

টুনি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী করবে শান্ত ভাইয়া?"

শান্ত বলল, "মজা বোঝাচ্ছি আমি কিডন্যাপারদের। তুই দাঁড়া এখানে।"

শান্ত কী করবে টুনি জানে না কিন্তু সেটা যে খুব ভালো কাজ হবে না, সেটা বুঝতে টুনির দেরি হলো না। সে খানিকটা ভয় নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দেখল শান্ত খুব সাবধানে পা টিপে টিপে গাড়ির পিছনে নিচু হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর মনে হলো চিৎ হয়ে শুয়ে গাড়ির নিচে ঢুকে গেল। টুনির বুক ধকধক করতে থাকে, যদি শান্ত ধরা পড়ে যায় তখন কী হবে?

AMARBOI.COM

শান্ত ধরা পড়ল না, কিছুক্ষণের মাঝেই সে ফিরে এলো। তাকে অবশ্যি শান্ত হিসেবে চেনা যায় না। গাড়ির নিচে যত ময়লা ছিল সবকিছু তার পিছনে লেগে আছে। শুধু তা-ই নয়, তার কপালে গ্রিজ এবং নাকের উপর কালি। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী করেছ শান্ত ভাইয়া?"

"গাড়ির নিচে ঢুকে চারটা চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

"ওরা বুঝতে পারেনি?"

"গাড়ি স্টার্ট না করা পর্যন্ত মনে হয় টের পাবে না।"

"ওদের কথা শুনেছ কিছু?"

"শুনেছি।

"কী বলছে?"

"মাহী কাঞ্চনের উপর খুব বিরক্ত হচ্ছে। বলছে তার মাথায় কোনো বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই!"

"তাই বলছে? কী আশ্চর্য!"

"হ্যাঁ, মাহী কাঞ্চনকে গালি দিচ্ছে।"

"কেন?"

"সময় নষ্ট করার জন্য।"

"কী আশ্চর্য!"

AMARBOI.COM

শান্ত এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "এই ঘরটার মাঝে এত পচা গন্ধ কেন? মনে হয় কেউ বাথরুম করে রেখেছে!"

টুনি ভয়ে ভয়ে বলল, "শান্ত ভাইয়া!"

"কী?"

"আসলে পচা গন্ধটা আসছে তোমার শরীর থেকে।"

"আমার শরীর থেকে?"

"হ্যাঁ! তোমার পিছনটা তো দেখতে পাচ্ছ না তাই জানো না। সেখানে অনেক কিছু আছে। তোমার এখনই গরম পানি আর সাবান দিয়ে গোসল করা উচিত।"

"কেন? কী আছে আমার পিছনে?"

"মনে হয় কুকুরের ইয়ে। মানুষেরও হতে পারে—"

শান্ত তখন একটা ভয়ের শব্দ করল, কাকে যেন খুব খারাপ ভাষায় গালি দিল। তারপর নাক-মুখ কুঁচকে ছুটল গোসল করতে। একটু

পরেই উপর থেকে শান্ত ভাইয়ার আম্মুর চিৎকার শোনা যেতে থাকল। এটা অবশ্যি নূতন কোনো বিষয় না—শান্ত ভাইয়ের আম্মুকে অনেক চিৎকার করতে হয়।

কথাবার্তা শেষ করে মাহী কাঞ্চন যখন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন বাচ্চারা আবার তাকে ঘিরে ধরল। তাদের সাথে মাহী কাঞ্চনের ছবি তুলতে হলো। প্রথমে গ্রুপ, তারপর আলাদা, শেষে সেলফি। তারপর সবাইকে অটোগ্রাফ দিতে হলো।

বাসার বড় মানুষেরাও মাহী কাঞ্চনকে একনজর দেখে গেল এবং একসাথে ছবি তুলে গেল। টুনির ভেতর অবশ্যি খুবই অশান্তি। সে মোটামুটি নিশ্চিত যে, ঘর থেকে বের হবার সাথে সাথে সাদা গাড়ি থেকে মানুষগুলো এসে মাহী কাঞ্চনকে টেনে গাড়িতে তুলে নেবে। তবে গাড়ি স্টার্ট করে বেশি দূর যেতে পারবে না, একটা হইচই-চিৎকার শুরু হবে, তখন সবাই মিলে হয়তো মাহী কাঞ্চনকে উদ্ধার করবে। পুরো ব্যাপারটা হবে খুবই ভয়ঙ্কর, খুবই ভয়ের এবং খুবই বিপদের। ছোটাচ্চুকে একটু জানিয়ে রাখতে পারলে খুব ভালো হতো কিন্তু সে কোনো সুযোগই পেল না।

তখন হঠাৎ করে টুনির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সব বাচ্চাদের সাথে নিয়ে গেলে কেমন হয়? মাহী কাঞ্চনকে সব বাচ্চারা ঘিরে থাকলে কিডন্যাপ করা নিশ্চয়ই এত সোজা হবে না! টুনি তাই হঠাৎ করে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো আমরা মাহী কাঞ্চন চাচ্চুকে আগিয়ে দিই। স্কুটারে না হয় ক্যাবে তুলে দিই।"

সব বাচ্চারা হইহই করে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এরকম সুযোগ তারা আর কখন পাবে? ছোটাচ্চু ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুযোগ পেল না, তার আগেই সব বাচ্চা মাহী কাঞ্চনকে ঘিরে তাকে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে। শুরুতে তাদের সাথে শান্ত ছিল না কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সেও চলে এলো, গোসল করে জামা-কাপড় পাল্টে এসেছে।

বাসা থেকে বের হবার সময় টুনির বুক ধকধক করতে থাকে, এক্ষুনি নিশ্চয়ই গাড়িটা স্টার্ট করে পাশে এসে দাঁড়াবে, ঝপাং করে

AMARBOI.COM

গাড়ির দরজা খুলে যাবে, কয়েকজন মুশকো জোয়ান বের হয়ে আসবে, তারপর বাচ্চাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মাহী কাঞ্চনকে ধরে টেনে নিয়ে যাবে। মানুষগুলোর হাতে কি বন্দুক-পিস্তল-ছোরা-চাকু কিছু থাকবে? যদি থাকে তাহলে কী হবে?

টুনি চোখের কোনা দিয়ে সাদা গাড়িটা দেখল, এখনো সেটা দাঁড়িয়ে আছে, স্টার্ট করেনি। কখন স্টার্ট করবে?

ছোটাচ্চু মাহী কাঞ্চনকে বলল, "আমরা একটু হেঁটে যাই। রাস্তার মোড়ে সিএনজি পাওয়া যায়। ভাগ্য ভালো থাকলে একটা ক্যাবও পাওয়া যেতে পারে।"

মাহী কাঞ্চন বলল, "চলেন যাই।"

"আপনাকে কেউ চিনে ফেললে সমস্যায় পড়ে যাব।"

"চিনবে না। যেখানে আমার থাকার কথা না সেখানে আমাকে কেউ চিনে না!"

বাচ্চারা মাহী কাঞ্চনকে ঘিরে এগুতে থাকে। অন্ধকারে টুনি আর শান্তর একটু চোখাচোখি হলো কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। পুরো দলটা যখন আরো এগিয়ে গেল তখন হঠাৎ টুনি শুনতে পেল গাড়িটা স্টার্ট করেছে, হেড লাইট জ্বলেছে, তারপর খুব ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করেছে। টুনির বুকটা ধকধক করতে থাকে, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল শান্তর শরীরটাও শক্ত হয়ে গেছে। কিডন্যাপাররা সত্যি এসে গেলে অন্যেরা কেউ কিছু না করলেও শান্ত নিশ্চয়ই একটা মারপিট শুরু করে দেবে। কী ভয়ঙ্কর! কী সাংঘাতিক!

টুনি দেখল গাড়িটা গুঁড়ি মেরে খানিকটা এসে হঠাৎ করে থেমে গেল। গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভার নেমে গাড়ির চাকাগুলো পরীক্ষা করে মাথায় হাত দিল। চাপা গলায় কিছু একটা বলল কিন্তু এত দূর থেকে কথাগুলো শোনা গেল না। গাড়ি খুলে তখন আরো দুজন মানুষ নেমেছে, তারাও গাড়িটা ঘুরে দেখছে। হতাশভাবে মাথা নাড়ছে। যার অর্থ গাড়িটা অচল, কিডন্যাপাররা আর গাড়ি নিয়ে আসতে পারবে না। টুনি বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিল।

মাহী কাঞ্চনকে নিয়ে পুরো দলটি তখন রাস্তার মোড়ে চলে এসেছে। সেখানে বেশ কয়েকটা সিএনজি আর একটা ক্যাব দাঁড়িয়ে আছে। ছোটাচ্চু বলল, "আপনাকে ক্যাবে তুলে দিই?"

AMARBOI.COM

মাহী কাঞ্চন মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে।"

ছোটাচ্চু তখন ক্যাব ঠিক করতে এগিয়ে গেল, ক্যাবের ড্রাইভারের সাথে কথা বলে ফিরে এসে বলল, "আসেন।"

মাহী কাঞ্চন ঠিক যখন ক্যাবে উঠতে যাবে তখন টুনি বলল, "ছোটাচ্চু, তোমার সাথে যাওয়া উচিত—ওনার একা যাওয়া ঠিক হবে না।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিকই বলেছিস।"

মাহী কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে বলল, "না না। কোনো দরকার নেই। আমি চলে যেতে পারব।"

ছোটাচ্চু বলল, "সেটা তো নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু আপনার মতো এত বড় একজন মানুষকে একা যেতে দেওয়া ঠিক না। আমি সাথে আসি, বাসাটাও চিনে আসি।"

ছোটাচ্চু তখন মাহী কাঞ্চনের সাথে ক্যাবের পিছনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ক্যাব চলে যাবার সময় সব বাচ্চারা মিলে হাত নাড়ল, গাড়ির ভেতর থেকে মাহী কাঞ্চন আর তার দেখাদেখি ছোটাচ্চুও হাত নাড়তে থাকল।

WWW.RBOI.COM

বচ্চাদের ছোট দলটি যখন ফিরে আসছে তখন তারা দেখল সাদা গাড়িটাকে রাস্তার পাশে দাঁড়া করানো হয়েছে। বাচ্চাদের দেখে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ এগিয়ে এলো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "মাহী চলে গেছে?"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "আপনারা কারা?"

মানুষটা বলল, "আমরা মাহীর বডি গার্ড। তাকে সব সময় পাহারা দেই। আজকে কোন হারামজাদা এসে গাড়ির চারটা চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—তাই তার পিছন পিছন যেতে পারলাম না!"

টুনির মুখ হাঁ হয়ে গেল। মানুষটা বলল, "মাহী কাঞ্চন অনেক বড় গায়ক হতে পারে কিন্তু তার মাথায় ঘিলু বলে কিছু নাই! মাত্র কয়দিন আগে ড্রাগ রিহ্যাব থেকে বের হয়েছে, কখন আবার কোন ছাগল তার হাতে ড্রাগ ধরিয়ে দেবে সেই জন্যে সব সময় তার পিছু পিছু থাকতে হয়। তাকে জানতে দেই না তাহলে চেঁচামেচি করে জান খেয়ে ফেলবে।"

টুনি বলল, "কিন্তু কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

টুনি কী বলবে বুঝতে পারল না। মানুষটা বলল, "তোমাদের বাসায় কেন এসেছিল পাগলটা?"

টুনি বলল, "আমার ছোটাচ্চু একজন ডিটেকটিভ। তাই তার কাছে এসেছিলেন।"

"ডিটেকটিভ? সত্যিকারের ডিটেকটিভ?"

"হ্যাঁ।"

"মাহী পাগলা এসে কী বলেছে তোমার ডিটেকটিভ চাচাকে?"

কী জন্যে এসেছিল সেটা টুনির জানার কথা না তাই ইতস্তত করে বলল, "সেটা তো ঠিক জানি না।"

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন বলল, "পাগল মানুষ। কখন তার মাথায় কী চিন্তা আসবে কে জানে!"

প্রথম মানুষটি পকেট থেকে ফোন বের করে কোথায় জানি ফোন করল, তারপর বলল, "শোনো। আমরা মাহীকে ফলো করতে পারছি না। কোন হারামজাদা গাড়ির চারটা চাকা ফ্যাটি করে দিয়ে গেছে। যাই হোক, চিন্তা কোরো না, মাহী নিশ্চয়ই কিছুক্ষণে বাসায় পৌঁছে যাবে। একা যায় নাই, সাথে একজন ডিটেকটিভও গেছে। তাই চিন্তার কিছু নাই।"

অন্য পাশ থেকে ফোন করে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করল পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে। মানুষটি বলল, "খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা। যদি আধ ঘণ্টার মাঝে না পৌঁছায় আমাকে ফোন কোরো।"

তারপর ফোনটা পকেটে রেখে ড্রাইভারকে বলল, "গাড়ির চাকা ঠিক করার একটা দোকান খুঁজে বের করো। আমরা গাড়ির সাথে আছি। তুমি যাও।"

ড্রাইভার চলে গেল। বাচ্চার দলের সাথে টুনি আর শান্তও ফিরে এলো। শান্ত টুনিকে ফিসফিস করে বলল, "মানুষটার কী মুখ খারাপ দেখেছিস? কী খারাপভাবে আমাকে গালি দিল! ছিঃ!"

আধ ঘণ্টা পরও মাহী কাঞ্চন তার বাসায় পৌঁছাল না। ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছে ভেবে আর দশ মিনিট অপেক্ষা করা হলো, তবুও মাহী তার বাসায় পৌঁছাল না। তখন মাহীকে ফোন করা হলো, দেখা গেল মাহীর ফোন বন্ধ। মাহী কাঞ্চনের বডি গার্ড দুজন তখন

ছুটে এলো টুনিদের বাসায়। ততক্ষণে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দেখা গেল ছোটাচ্চু বাসায় ফিরেনি। ছোটাচ্চুকে ফোন করা হলো, দেখা গেল তার ফোনও বন্ধ। হঠাৎ করে সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

ক্যাবে ওঠার পর ছোটাচ্চু বা মাহী কাঞ্চনের কেউই বুঝতে পারল না যে, তারা খুব বড় একটা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মাঝেই তারা অবশ্যি সেটা আঁচ করতে পারল, কারণ ক্যাবটা হঠাৎ করে মাহী কাঞ্চনের বাসার দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে যেতে শুরু করল। ছোটাচ্চু চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে? কোন দিকে যাচ্ছেন?"

ড্রাইভার কোনো কথা বলল না, ক্যাব চালিয়ে যেতে লাগল। ছোটাচ্চু এবারে ধমক দিয়ে বলল, "কী হলো, কই যাচ্ছেন আপনি?"

ড্রাইভার এবারেও কোনো কথা বলল না। ছোটাচ্চু বলল, "গাড়ি থামান। আমরা নেমে যাব।"

এবারে ড্রাইভার কথা বলল, "আমি থামাতে পারি। আপনি নামতে পারবেন?" তারপর হা হা করে হাসতে লাগল।

ক্যাবের ড্রাইভার কেন হাসছে ছোটাচ্চু সাথে সাথেই বুঝতে পারল, কারণ ক্যাবের ভেতর দরজা খোলার হ্যান্ডেলগুলো নেই। ভেতর থেকে যেন কেউ খুলতে না পারে সে জন্যে খুলে রাখা হয়েছে। ছোটাচ্চু শুধু শুধু দরজায় কয়েকটা ধাক্কা দিল। কোনো লাভ হলো না, দরজা খুলল না। খুললেও কোনো লাভ হতো না, চলন্ত গাড়ি থেকে ছোটাচ্চু কিংবা মাহী কাঞ্চন কেউই নামতে পারত না।

ছোটাচ্চু মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সে এই নিয়ে তৃতীয়বার ছিনতাই হতে যাচ্ছে। প্রথমবার খুব ভয় পেয়েছিল, দ্বিতীয়বার সেরকম ভয় পায়নি। এবারে ব্যাপারটা তার কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হতে থাকে। এরপর কী করা হবে ছোটাচ্চু সবকিছু জানে, কাজেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা বের করে জুতোর ভিতরে ঢুকিয়ে নিল—অন্য কিছু করে লাভ নেই, বিপদ হয়ে যেতে পারে। মোবাইল ফোনের সিমটা খুলে নিতে পারে কিন্তু সেটা সাধারণত ছিনতাইকারীরা নিজেরাই করে দেয়। তাদের জন্যেও কিছু কাজ রাখা দরকার।

ক্যাবটা তখন উল্টো দিকে যাচ্ছে, মোটামুটি একটা নির্জন জায়গায় ক্যাবটা থামবে, তখন দুই পাশ থেকে আসল ছিনতাইকারীরা উঠবে। তাদেরকে ছিনতাই করে চোখে মলম লাগিয়ে দেবে। ছিনতাইকারীরা কী রকম, তার উপর নির্ভর করে তাদের সাথে কী রকম ব্যবহার করবে। সাধারণত খুবই খারাপ ব্যবহার করে—ছিনতাই হওয়ার এটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ অংশ, সে জন্যে অনেক দিন মন-মেজাজ খারাপ থাকে। মানুষ যখন মানুষকে সম্মান করে কথা না বলে, তার থেকে বড় অপমান আর কিছু নেই।

ছোটাচ্চু হঠাৎ দেখল তার পাশে মাহী কাঞ্চন থরথর করে কাঁপছে। মানুষটা মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। ছোটাচ্চু তাকে ধরে ডাকল, "কাঞ্চন ভাই।"

মাহী কাঞ্চন কোনো উত্তর দিল না, থরথর করে কাঁপতেই লাগল। ছোটাচ্চু মাহী কাঞ্চনকে ধরে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কাঞ্চন ভাই, কথা বলেন।"

মাহী কাঞ্চন কোনো কথা বলল না, থরথর করে কাঁপতেই থাকল। ছোটাচ্চু বলল, "আপনি কি ভয় পেয়েছেন? ভয়ের কিছু নাই। আমি আছি।"

মাহী কাঞ্চন এবারে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু কথাগুলো বোঝা গেল না, অবোধ্য বিলাপের মতো শোনা গেল। ছোটাচ্চু মাহী কাঞ্চনের হাতটা ধরে রেখে ফিসফিস করে বলতে লাগল, "কোনো ভয় নাই। আপনার কোনো ভয় নাই। আমি আছি। আমি আপনাকে দেখে-শুনে রাখব। টাকা-পয়সা নিয়ে যাবে, আর কিছু হবে না। আপনার আর কোনো ক্ষতি হবে না! আমি থাকতে আপনার গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারবে না।"

হঠাৎ করে ক্যাবটা থেমে গেল, ড্রাইভার বলল, "এই যে থামালাম। নামতে চাইলে নামো।" আগে আপনি করে বলছিল এখন তুমি করে বলছে। একটু পরে তুই করে বলবে। ক্যাবের ড্রাইভার কথা শেষ করে হা হা করে হাসতে থাকল, যেন খুব একটা উঁচুদরের রসিকতা করেছে। ছোটাচ্চু যেরকম ভেবেছিল ঠিক সে রকম দুই পাশ থেকে দুইজন এসে গাড়ির দরজা খুলে ঢুকে গেল আর সাথে সাথে ক্যাবটা ছেড়ে দেয়।

AMARBOI.COM

মানুষ দুইজন হাতে লুকানো দুটো চাকু বের করে, কোথায় চাপ দিতেই চাকুর ফলা বের হয়ে আসে, ভয় দেখানোর অনেক পুরানো কায়দা। ছোটাচ্চুর জন্যে ঠিক আছে কিন্তু মাহী কাঞ্চনের জন্যে এটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ করে তার সারা শরীরে খিঁচুনির মতো শুরু হয়ে গেল, মনে হলো মুখ থেকে ফেনা বের হয়ে আসছে। মানুষটির মনে হয় হার্ট এটাক হয়ে যাবে।

ছিনতাইকারী দুইজন অবশ্যি এর কিছুই লক্ষ করল না, একজন চাকুটা মাহী কাঞ্চনের মুখের উপর নাড়াতে নাড়াতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "আজকের মক্কেল কী রকম ওস্তাদ?"

"হাতে ব্যাগ নাই, ল্যাপটপ-ক্যামেরা নাই।"

"ফকিরনীর পুতদের দিয়া বউনি?"

"হ।"

ছোটাচ্চু মাথা ঠাণ্ডা রাখল। ছিনতাইকারীদের কুৎসিত গালাগাল ঠাণ্ডা মাথায় হজম করল, নিজের মানি ব্যাগ, মোবাইল ফোন তুলে দিল, মাহী কাঞ্চনের পকেট থেকে মানি ব্যাগ, মোবাইল বের করে দিতে সাহায্য করল। মাহী কাঞ্চন কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়েছিল, ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না। ছোটাচ্চু সারাক্ষণ মাহী কাঞ্চনের হাত ধরে রেখে ফিসফিস করে তার কানের কাছে বলতে লাগল, "ভয় নাই। কোনো ভয় নাই। আমি আছি। আপনার কোনো কিছু হতে দিব না, আপনাকে রক্ষা করব—"

মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুর কোনো কথা শুনল বলে মনে হলো না। ছিনতাইকারী দুজন নেবার মতো যা কিছু আছে তা নিয়ে পকেট থেকে মলমের কৌটা বের করল, কোনো লাভ হবে না জেনেও ছোটাচ্চু নরম গলায় একটু অনুরোধ করল, বলল, "এটা না দিলে হয় না! আমাদের যা ছিল সব তো দিয়েই দিয়েছি! অন্ধকারে তো এমনিতেই কিছু দেখছি না।"

ছোটাচ্চুর পাশে বসে থাকা ছিনতাইকারী হা হা করে হেসে বলল, "কী কইতাছস তুই বেকুবের মতো! এইটা হচ্ছে আমাগো বিজনেসের ট্রেড মার্ক। এইটা না দিলে হয়?"

তারপর প্রথমে খপ করে মাহী কাঞ্চনের চুলের ঝুঁটি ধরে জোর করে চোখের পাতা খুলে এক দলা মলম ঢুকিয়ে দিল। প্রথমে বাম

AMARBOI.COM

চোখে তারপর ডান চোখে। মাহী কাঞ্চন প্রথমে কেমন যেন গোঙানোর মতো শব্দ করল, তারপর দুই চোখ বন্ধ করে চুপ হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ছোটাচ্চুর দুই চোখেও মলম ঢুকিয়ে দিল, বাধা দিয়ে লাভ নেই জেনেও ছোটাচ্চু নিজের অজান্তেই খানিকক্ষণ নিজের চোখকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, কোনো লাভ হলো না। উল্টো ধারালো চাকুর খোঁচায় কব্জির কাছে খানিকটা কেটে গেল। কী দিয়ে এই মলম তৈরি করে কে জানে—চোখের ভেতরে দেয়া মাত্রই দুই চোখ ভয়ঙ্করভাবে জ্বলতে থাকে, কিছুতেই আর চোখ খোলা রাখতে পারে না।

গাড়ির সামনে থেকে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "মক্কেলগো রেডি করছস?"

"জে ওস্তাদ। মক্কেল রেডি।"

"গাড়ি থামাই?"

"থামান ওস্তাদ।"

ছোটাচ্চু টের পেল হঠাৎ করে ক্যারিটা থেমে গেছে। বাম পাশের দরজাটা খোলার শব্দ হলো, তারপর ধাক্কা দিয়ে মাহী কাঞ্চন আর ছোটাচ্চুকে তারা রাস্তার পাশে কাঁদার মাঝে ফেলে দিল। প্রায় সাথে সাথেই ঝপাং শব্দ করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো, তারপর গাড়িটা মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোটাচ্চু বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে মাহী কাঞ্চনকে টেনে দাঁড়া করাল। বলল, "কাঞ্চন ভাই, আর কোনো ভয় নাই। বদমাইশগুলো পালিয়েছে।"

মাহী কাঞ্চন কথাগুলো শুনল কি না বোঝা গেল না। শুনলেও বুঝল কি না সেটাও বোঝা গেল না। থরথর করে কাঁপতেই লাগল। ছোটাচ্চু বলল, "চোখের মলম নিয়ে ভয়ের কিছু নাই, ডাক্তারের কাছে গেলেই চোখ ওয়াশ করে দিবে।"

মাহী কাঞ্চন এই কথাগুলোও শুনল বলে মনে হলো না, থরথর করে কাঁপতেই থাকল। ছোটাচ্চু বলল, "কাঞ্চন ভাই, এখন আর ভয় নাই। চলেন হাঁটি, মানুষজন পেয়ে যাব। আপনাকে দেখলেই সবাই পাগল হয়ে যাবে।"

মাহী কাঞ্চন দাঁড়িয়েই রইল, ছোটাচ্চু তখন তাকে ধরে টেনে টেনে নিতে থাকে। চোখ জ্বালা করছে বলে চোখ খুলে দেখতে পারছে না, তার মাঝে কষ্ট করে মাঝে মাঝে চোখটা একটু খুলে আন্দাজ করার চেষ্টা করল কোন দিকে যাচ্ছে। ছোটাচ্চু জানে যে কোনো দিকে একটু হাঁটলেই মানুষজন, দোকানপাট কিছু একটা পেয়ে যাবে। মাহী কাঞ্চনের জন্যে হঠাৎ করে তার কেমন যেন দুশ্চিন্তা হতে থাকে, এই মানুষটি নিশ্চয়ই কখনো এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়েনি।

হঠাৎ করে মাহী কাঞ্চন দাঁড়িয়ে গেল, তারপর বলল, "গান!"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কীসের গান?"

মাহী কাঞ্চনের কাঁপুনি হঠাৎ করে কমে আসে, প্রথমবার সে পরিষ্কার শান্ত গলায় বলল, "আমার গান।"

"আপনার গান?"

"হ্যাঁ, নিশি রাইতে চান্দের আলো—" বলেই গুনগুন করে সে গানটা দুই লাইন গেয়ে ফেলল, সাথে সাথে ছোটাচ্চুর গানটা মনে পড়ে যায়, কতবার শুনেছে! এই গানটা গেয়েই মাহী কাঞ্চন রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন হঠাৎ করে মাহী কাঞ্চন এই গানটার কথা বলছে কেন? ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "এই গানটার কী হয়েছে?"

"বাজাচ্ছে।"

"কে বাজাচ্ছে?"

"জানি না। শুনতে পাচ্ছ না?"

ছোটাচ্চু তখন কান পেতে শোনার চেষ্টা করল এবং হঠাৎ মনে হলো সত্যিই দূর থেকে খুব অস্পষ্টভাবে গানটা শোনা যাচ্ছে। আশেপাশে কোথাও গানটি বাজছে। ছোটাচ্চু বলল, "চলেন যাই, কোথায় গান বাজছে দেখি। মানুষজন পাওয়া যাবে সেখানে।"

মাহী কাঞ্চন বলল, "চলো।"

মাহী কাঞ্চন তাকে আপনি করে বলত, হঠাৎ তুমি করে বলতে শুরু করেছে! ছোটাচ্চু অবশ্যি কিছু মনে করল না, প্রায় তার সমবয়সী কিংবা এক-দুই বছর বড় হতে পারে, তুমি করে ডাকতেই পারে। ছোটাচ্চু মাহী কাঞ্চনের হাত ধরে বলল, "চোখ বন্ধ করে হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে না তো?"

AMARBOI.COM

"তা হচ্ছে। তুমি পারলে আমিও পারব।"

গানের শব্দ শুনে শুনে তারা কিছুক্ষণের মাঝেই রাস্তার পাশে একটা ছোট টংয়ে হাজির হলো। টংয়ের ভেতর একটা ছোট টেলিভিশন, সেখানে মাহী কাঞ্চন একটা গিটার হাতে নিয়ে 'নিশি রাইতে চান্দের আলো' গান গাইছে। টংয়ের সামনের বেঞ্চে বসে কয়েকজন মানুষ চা খেতে খেতে গান শুনছে। আবছা আলোতেও ছোটাচ্চু আর মাহী কাঞ্চনের চেহারা দেখে সবাই বুঝে গেল কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, কয়েকজন দাঁড়িয়ে বলল, "কী হইছে আপনাগো?"

ছোটাচ্চু বলল, "মলম পার্টি।"

আর কিছুই বলতে হলো না, সাথে সাথে সবাই কী হয়েছে বুঝে গেল। একজন মানুষ প্রায় আর্তনাদের মতো শব্দ করে বলল, "কী হইল দেশটার? এই সপ্তাহে আপনারা এইখানে দুই নম্বর পার্টি!"

টংয়ে বসে থাকা মানুষটা কাকে যেন ডেকে বলল, "এই শামসু, এক বালতি পানি আন তাড়াতাড়ি। আর সাবান।" তারপর ছোটাচ্চু আর মাহী কাঞ্চনকে বলল, "আপনারা বসেন। আপনাগো আর কোনো ভয় নাই। আমরা আছি।"

টেলিভিশনে মাহী কাঞ্চনের গান শেষ হবার সাথে সাথে একজন উপস্থাপিকা মিষ্টি গলায় বলল, "আপনারা এতক্ষণ আপনাদের প্রিয় মাহী কাঞ্চনের গান শুনছিলেন। এই মাত্র আমরা খোঁজ পেয়েছি জনপ্রিয় গায়ক মাহী কাঞ্চন নিখোঁজ। তিনি এবং তার এক সহযোগী সম্ভবত দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েছেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ এবং র‍্যাবের তল্লাশি চলছে।"

ছোটাচ্চু প্রায় চিৎকার করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুকে থামাল।

টেলিভিশনের উপস্থাপিকা বলল, "আমাদের রিপোর্টার ফয়সল খান মাহী কাঞ্চনের বাসভবনে আছেন, আমরা এখন তার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে পাচ্ছি।"

মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুর হাত ধরে বলল, "প্লিজ, আপনি এখানে আমার পরিচয় দেবেন না!"

"কেন?"

AMARBOI.COM

"সাংবাদিক-পুলিশ আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

"আপনি তো কোনো দোষ করেননি! আপনার সমস্যা কী? যা হয়েছে বলবেন!"

"মাহী কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না। কী হয়েছে আমার কিছু মনে নাই!"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কিছু মনে নাই?"

"না। আবছা মনে আছে কেউ একজন একটা চাকু নাচাচ্ছে—তারপর দেখলাম আমি চোখ বন্ধ করে রাস্তায় কাদার মাঝে দাঁড়িয়ে আছি, অনেক দূর থেকে একটা গান শোনা যাচ্ছে নিশি রাইতে চান্দের আলো—এর মাঝখানে কী হয়েছে আমি কিছু জানি না!"

"কী আশ্চর্য!"

"তাই বলছিলাম তুমি আমাকে বাঁচাও। সাংবাদিক-পুলিশের হাত থেকে বাঁচাও।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক আছে দেখছি!"

ততক্ষণে একটা ছোট ছেলে কাছাকাছি টিউবওয়েল থেকে এক বালতি পানি আর ছোট একটা নতুন সাবান নিয়ে এসেছে। ছোটাচ্চু আর মাহী কাঞ্চন দুজনে মিলে তখন চোখে পানি দিতে লাগল, চোখ ধোয়ার চেষ্টা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধোয়ার পর চোখে একটু আরাম হলো, দুজনেই তখন চোখ মেলে একটু একটু দেখতে শুরু করল।

টংয়ের মানুষটি দুই কাপ চা বানিয়ে এনেছে। দুজনের কারোরই এখন চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু মানুষটির আন্তরিকতা দেখে আর না করতে পারল না।

ছোটাচ্চু চা খেতে খেতে বলল, "আপনারা আমাদের বিশ্বাসী একজন রিকশাওয়ালা কিংবা সিএনজি ড্রাইভার দিতে পারবেন?"

পাশের বেঞ্চে বসে শক্ত-সমর্থ একজন মানুষ চা খাচ্ছিল, বলল, "আমি আপনাগো আমার রিকশা দিয়া নিয়া যামু। কোনো চিন্তা নাই।"

আশেপাশে দাঁড়িয়ে-বসে থাকা মানুষগুলো মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মফিজ তুই-ই সাহেবদের লইয়া যা। তোর ধারে-কাছে কোনো সন্ত্রাসী আইব না।"

তাই কিছুক্ষণের মাঝে মফিজ নামের শক্ত-সমর্থ রিকশাওয়ালা তার নতুন রিকশায় ছোটাচ্চু আর মাহী কাঞ্চনকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলল। কার সাধ্যি আছে তার ধারে-কাছে কেউ আসে?

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ছোটাচ্চু মাহী কাঞ্চনকে নিয়ে তাদের বাসায় পৌঁছাল, দুজনকে দেখে বাচ্চারা যেভাবে চিৎকার করে উঠেছিল সেটা শুনে আশেপাশে কয়েকটা বাসার ছোট বাচ্চারা চমকে ঘুম থেকে উঠে তাদের কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছিল।

রাত বারোটার সময় সব টেলিভিশন চ্যানেলে একটা বিশেষ বুলেটিনে জানানো হলো মাহী কাঞ্চন নিরাপদে ফিরে এসে একটা অজ্ঞাত প্রাইভেট ক্লিনিকে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি সুস্থ আছেন এবং ডাক্তারের নির্দেশে তিনি কারো সাথে কথা বলছেন না।

ঠিক তখন আসলে মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুর একটা লুঙ্গি আর টি-শার্ট পরে খেতে বসেছে। দুশ্চিন্তায় বাসায় কারো খাওয়ার কথা মনে ছিল না, খেতে বসে দেখা গেল সবার প্রচণ্ড খিদে। ঝুমু খালা বলে পুরো খাওয়ার পর্বটা সামলে নেয়া গেল তবে সেও হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল। মাহী কাঞ্চন যখন বলল ঝুমুর রান্না করা টাকি মাছের ভর্তার মতো সুস্বাদু খাবার সে জীবনে খায়নি তখন ঝুমু খালার মুখে যে হাসিটা ফুটে উঠেছিল সেটা দেখার মতো একটা বিষয় ছিল।

রাত একটার দিকে সবাইকে শুতে পাঠানোর চেষ্টা শুরু হলো কিন্তু কাউকে শুতে পাঠানো গেল না। মাহী কাঞ্চনও জানাল সে এত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারে না। তখন তাকে একটা গান গাওয়ার অনুরোধ করা হলে সে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। তিনতলায় মেজ চাচির হারমোনিয়াম নিয়ে আসা হলো এবং মাহী কাঞ্চন রাত তিনটা পর্যন্ত সবাইকে গান গেয়ে শোনাল। (শান্ত মনে মনে হিসেব করে বের করল এই গানগুলো যদি রেকর্ড করে সিডি বানিয়ে বিক্রি করতে পারত তাহলে তার নিট লাভ হতো সাড়ে তিন লক্ষ টাকা!)

রাত সাড়ে তিনটার দিকে বাচ্চাদেরকে জোর করে বিছানায় পাঠানো হলো। তার আগে সবার সাথে মাহী কাঞ্চনের নূতন করে আরো একবার সেলফি তুলতে হলো। মলম লাগানোর কারণে টকটকে লাল চোখের সেলফির নাকি গুরুত্ব অন্য রকম।

ভোররাত চারটার দিকে মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুর বিছানায় এবং ছোটাচ্চু সোফায় শুতে গেল। (ছোটাচ্চু নিজেও লক্ষ করেনি ঠিক কখন থেকে সে মাহী কাঞ্চনকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে।)

ঘুম আসছিল না বলে টুনি ভোররাতে একবার উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। সে দেখল তাদের বাসার সামনে একটা সাদা গাড়ি। দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল গাড়ির ভেতর কয়েকজন মানুষ বসে আছে।

দুই সপ্তাহ পর মাহী কাঞ্চন তার একটা কনসার্ট শুরু করার আগে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলল, "আজকের এই কনসার্টটি আমি উৎসর্গ করতে চাই এমন একজন মানুষকে, যে আমার জীবন বাঁচিয়েছে বলে আমি আজ আপনাদের সামনে হাজির হতে পেরেছি। নিজের জীবন বিপন্ন করে যে মানুষটি আমার জীবন বাঁচিয়েছে তার নাম শাহরিয়ার, মানুষটি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি নামে বাংলাদেশের প্রথম ডিটেকটিভ এজেন্সি শুরু করেছে। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা। আমার কৃতজ্ঞতা এবং আমার ভালোবাসা।"

বলাই বাহুল্য, এরপর ছোটাচ্চুকে বনানীতে একটা অফিস ভাড়া করতে হয়েছে, একজন অফিস সহকারীসহ তিনজন মানুষকে নিতে হয়েছে। দুইজন পুরুষ, একজন মেয়ে। তারপরও তারা কাজ করে কুলাতে পারছে না। মনে হয় আরো বড় অফিস, আরো কিছু মানুষ নিতে হবে। একটা গাড়ি কিনতে হবে, সাথে একজন ড্রাইভার।

সব মিলিয়ে টুনিও খুব ব্যস্ত!

MURCHONA.COM

কয়দিন থেকে ছোটাচ্চুর কেমন জানি মন খারাপ। এই বাসার বাচ্চা-কাচ্চারা ছোটাচ্চুকে কখনো মন খারাপ করতে দেখেনি, তাই সবাই কেমন জানি অবাক হয়ে গেছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। ছোটাচ্চুকে সরাসরি এক-দুইবার জিজ্ঞেসও করা হয়েছে কিন্তু ছোটাচ্চু ঠিক করে উত্তরও দেয়নি। যেমন একদিন ছোটাচ্চু তার বিছানায় পা তুলে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, টুনি তার ঘরে ঢুকল। ছোটাচ্চু মাথা ঘুরিয়ে একবার টুনির দিকে তাকাল কিন্তু টুনিকে দেখল বলে মনে হলো না। টুনি ডাকল, "ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু উত্তর দিল না। টুনি তখন আবার ডাকল, "ছোটাচ্চু।" এবারে আগের থেকে একটু জোরে।

ছোটাচ্চু এবারে উত্তর দিল। বলল, "উঁ।" তারপর টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "কে? টুনি?" যেন তাকে প্রথম দেখছে!

টুনি মাথা নাড়ল, তারপর ছোটাচ্চুর কাছে গিয়ে বলল, "ছোটাচ্চু, তোমার কী হয়েছে?"

"আমার?" ছোটাচ্চু জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "আমার কী হবে? কিছু হয় নাই।"

"তাহলে তুমি কথা-টথা বলো না কেন?"

"কে বলে কথা বলি না? এই যে বলছি!"

"আগে প্রত্যেক দিন এসে তোমার অফিসে কী হচ্ছে সেগুলো বলতে, এখন কিছু বলো না।"

"কেন? আমি সেদিন বললাম না অফিসে কী হয়েছে। একটা খুব বড় ক্লায়েন্ট এসেছে, ওরা ভেবেছে চাঁদাবাজ—"

টুনি মাথা নাড়ল, "না ছোটাচ্চু তুমি সেটা বলো নাই। চাঁদাবাজ ভেবে কী করেছে সেটা বলো নাই।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "বলেছি।"

টুনি তার মুখ আরো শক্ত করে বলল, "বলো নাই।"

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ফোঁস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ও আচ্ছা। বলি নাই!"

টুনি বলল, "তাহলে বলো কী হয়েছে।"

ছোটাচ্চু ঘ্যাসঘ্যাস করে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "তুই তো আমাদের অফিসটা দেখেছিস। রিসেপশনে রঞ্জনা বসে আছে, তখন চ্যাংড়া মতো একটা মানুষ ঢুকেছে—দেখে মনে হয় লাফাংঙা-ফালতু মানুষ। রঞ্জনা বলল—"ছোটাচ্চু হঠাৎ কথা থামিয়ে ছাদের দিকে তাকাল, তারপর তাকিয়েই রইল।

টুনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে জিজ্ঞেস করল, "কী বলল?"

ছোটাচ্চু ছাদ থেকে চোখ ফিরিয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বলল?"

"হ্যাঁ। রঞ্জনা আপু কী বলল?"

ছোটাচ্চু আবার ঘ্যাসঘ্যাস করে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আজকে বলার ইচ্ছা করছে না। আরেক দিন বলব।"

টুনি কিছুক্ষণ ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ছোটাচ্চু।"

"উঁ।"

"তোমার কী হয়েছে বলবে?"

"কিছু হয় নাই।"

"হয়েছে ছোট চাচ্চু। আমাকে বলো।"

"কিছু হয় নাই।"

"হয়েছে।"

ছোটাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুই বড় বিরক্ত করছিস টুনি। এখন যা দেখি।"

ছোটাচ্চু সব সময় বাসার বাচ্চাদের ধমকা-ধমকি দেয়, বকাবকি করে, এমনকি মাঝে মাঝে ঘাড়ে ধরে ঝাঁকুনিও দেয়—কেউ কিছু মনে করে না। কিন্তু হঠাৎ করে আজকে ছোটাচ্চুর গলার স্বর শুনে টুনি

AMARBOI.COM

কেমন যেন চমকে উঠল, সে আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রি বেলা বাচ্চারা সবাই একটা গোলটেবিল বৈঠকে বসেছে। সবাই যে একটা গোলটেবিল ঘিরে বসেছে তা নয়—সত্যি কথা বলতে কী, তারা যেখানে বসেছে সেখানে কোনো টেবিলই নেই, সবাই মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসেছে। তারপরেও এটাকে রীতিমতো গোলটেবিল বৈঠক বলা যায়। আলোচ্য বিষয় 'ছোটাচ্চু'। সত্যিকারের গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতি থাকে, সবাইকে তার কথা শুনতে হয়—এখানে সেরকম কেউ নেই। বাচ্চারা সবাই একসাথে কথা বলে, যার গলা সবচেয়ে উপরে ওঠে সবাইকে তার কথা শুনতে হয়।

এটা মোটেও অবাক ব্যাপার না যে শান্তর গলা সবচেয়ে বেশি উপরে ওঠে, সে গলা উঁচিয়ে বলল, "পুরাপুরি ঘিংরি-ভিংরি।"

একজন জানতে চাইল, "ঘিংরি-ভিংরি মানে কী?"

শান্ত বলল, "মানে আউলা-ঝাউলা।"

প্রমি ধমক দিয়ে বলল, "ঢং না করে কী বলতে চাস পরিষ্কার করে বল।"

শান্ত বলল, "আমি বলতে চাচ্ছি ছোটাচ্চুর কথা। ছোটাচ্চু পুরাপুরি ঘিংরি-ভিংরি। আউলা-ঝাউলা হয়ে গেছে।"

টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চু এত সুইট ছিল, এখন কথা বলে না। মুখ ভোঁতা করে থাকে।"

একজন বলল, "খায় না।"

আরেকজন বলল, "না, না, অনেক বেশি খায়। কী খাচ্ছে জানে না—খেতেই থাকে, খেতেই থাকে। প্লেটের উপর একটা ত্যানা রাখলে ত্যানাটাও খেয়ে ফেলবে।"

আরেকজন বলল, "শেভ করে না। মুখে বিন্দি বিন্দি দাড়ি।"

আরেকজন বলল, "কিন্তু শেভ না করাটা এখন স্টাইল। সব নায়কদের মুখে এখন বিন্দি বিন্দি দাড়ি থাকে।"

আরেকজন বলল, "কিন্তু ছোটাচ্চুর দাড়ি স্টাইলের দাড়ি না। এইটা আউলা-ঝাউলা দাড়ি।"

ছোট একজন বলল, "সেই দিন এত বড় একটা মাকড়সা দেখেও চিৎকার করে নাই।"

সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, "চিৎকার করে নাই?"

"না।"

"লাফ দেয় নাই? বাবারে বলে নাই? মাইয়ারে বলে নাই?"

ছোটজন বলল, "না, খালি মুখটা বাঁকা করে সরে গেছে।"

"কী সর্বনাশ!"

শান্ত বলল, "বলেছি না আমি, পুরা ঘিংরি-ভিংরি।"

প্রমি বলল, "আসল কথাটাই তো এখনো বলি নাই।"

সবাই জানতে চাইল, "আসল কথাটা কী?"

"সেই দিন ছোটাচ্চুর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তখন শুনি—"

"কী শুনো?"

"ছোটাচ্চু রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনছে।"

"সর্বনাশ। কোনটা শুনছে?"

"সবচেয়ে ডেঞ্জারাসটা, জেনেশুনে বিষ খাওয়ারটা!"

বাচ্চাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ পড়ল। এটা মোটেও তাদের পরিচিত ছোটাচ্চু না। তাদের পরিচিত ছোটাচ্চু বেশিরভাগ সময় ইংরেজি গান শুনে। মাকড়সা দেখলে 'বাবারে, খায়া ফেলল রে' বলে চিৎকার করে লাফ দিয়ে সরে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে। তাদের ছোটাচ্চু উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে ঘরে বসে থাকে না। তাদের পরিচিত ছোটাচ্চুর মুখে আউলা-ঝাউলা বিন্দি বিন্দি দাড়ি থাকে না। তাদের পরিচিত ছোটাচ্চুর কিছু একটা হয়েছে, তারপর অন্য রকম ছোটাচ্চু হয়ে গেছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ছোটাচ্চুর কী হয়েছে?"

"ভাইরাস!" টুম্পা বলল, "আমি পড়েছি ভাইরাস দিয়ে এগুলো হয়?"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পড়েছিস?"

টুম্পা বলল, "আমাদের স্কুলের বাথরুমের দেওয়ালে একজন লিখেছে।"

AMARBOI.COM

আরেকজন বলল, "স্কুলের বাথরুমে শুধু খারাপ খারাপ কথা লিখে।"

টুম্পা বলল, "মাঝে মাঝে ভালো কথাও লিখে।"

প্রমি বলল, "স্কুলের বাথরুমে লেখা জিনিস বিশ্বাস করার কোনো দরকার নাই। মন খারাপ হওয়ার ভাইরাস থাকতেও পারে। আমি জানি না।"

আরেকজন বলল, "সোজা চিকিৎসা। এন্টিবায়োটিক্স।"

প্রমি বলল, "এন্টিবায়োটিক্স ব্যাকটেরিয়ার জন্য। এটা দিয়ে ভাইরাস দূর করা যায় না।"

কে জানি গর্জন করে উঠল, "যায়।"

প্রমি বলল, "যায় না।"

তারপর ঝগড়া লেগে গেল, ঝগড়াটা থামাল শান্ত, কারণ সে গলা উঁচিয়ে বলল, "আসলে ছোটাচ্চুর কী হয়েছে বুঝতে পারছিস না?"

সবাই ঝগড়া থামিয়ে শান্তর দিকে তাকাল, "কী হয়েছে?"

শান্ত মুখ গম্ভীর করে বলল, "জীনে ধরেছে।"

"জীন?"

"হ্যাঁ। ছোটাচ্চু বাসায় আসতে অনেক দেরি করে না?"

"তাতে কী হয়েছে?"

"রাস্তার মোড়ে একটা গাব গাছ আছে। অনেক রাত্রে ছোটাচ্চু যখন সেই গাব গাছের নিচে দিয়ে আসে তখন একদিন জীন ধরেছে।"

একজন আপত্তি করল, "ঐটা মোটেও গাব গাছ না। ঐটা আম গাছ।"

শান্ত বলল, "একই কথা।"

"একই কথা না।"

তখন আবার ঝগড়া লেগে গেল, তখন ঝগড়া থামাল গুড্ডু। সে রিনরিনে গলায় বলল, "ছেলেদেরকে জীনে ধরে না। মেয়েদেরকে জীনে ধরে। ছেলেদেরকে ধরে পরী।"

শান্ত মেঘস্বরে বলল, "তোকে কে বলেছে?"

"ঝুমু খালা।"

AMARBOI.COM

এসব বিষয়ে ঝুমু খালার থেকে বড় এক্সপার্ট পৃথিবীতে নেই। তাই সবাইকে মেনে নিতেই হলো যে ছোটাচ্চুকে জীনে ধরেনি, কিছু একটা ধরে থাকলে সেটা নিশ্চয়ই পরী। শান্ত পর্যন্ত মেনে নিল, বলল, "ঠিক আছে। তাহলে পরী ধরেছে।"

একজন জানতে চাইল, "পরী ধরলে কী করতে হয়?"

"তাবিজ দিতে হয়।"

"তাবিজ কোথায় পাব?"

"আসল সোলেমানী জাদু নামে একটা বই আছে। সেই বইয়ে সব রকম তাবিজ আছে। জীন-ভূত দূর করার তাবিজ। বউ বশ করার তাবিজ। বিছানায় পিশাব বন্ধ করার তাবিজ। অদৃশ্য হওয়ার তাবিজ।"

অনেকেই চোখ বড় বড় করে বলল, "অদৃশ্য হওয়ার তাবিজ আছে?"

"আছে। খুবই জটিল।"

হঠাৎ করে ছোটাচ্চুর সমস্যা থেকে আলোচনাটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দিকে ঘুরে গেল। প্রমি তখন সবাইকে ধমক দিয়ে আলোচনাটা আবার আগের লাইনে নিয়ে আসে। সে বলল, "আমার মনে হয় না ছোটাচ্চুকে জীন-পরীতে ধরেছে। কিছু একটা হয়েছে সেই জন্যে ছোটাচ্চুর মন খারাপ।"

একজন বলল, "ছোটাচ্চুর এখন মন খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নাই। ছোটাচ্চুর প্রাণের বন্ধু হচ্ছে মাহী কাঞ্চন। সব কনসার্টে মাহী কাঞ্চন ছোটাচ্চুকে নিয়ে যায়। আগে বড় মানুষেরা ছোটাচ্চুর আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি নিয়ে ঠাট্টা করত। এখন করে না। এখন ছোটাচ্চুর নিজের অফিস আছে। দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিটেকটিভ রেখেছে। বড় বড় লোকজন ছোটাচ্চুর কাছে বুদ্ধি নিতে আসে। ছোটাচ্চুকে তিনবার টেলিভিশনে দেখিয়েছে—"

একজন প্রতিবাদ করল, "চারবার—"

"তিনবার।"

"চারবার—একবার সাইড থেকে—"

AMARBOI.COM

এটা নিয়েও ঝগড়া শুরু হতে পারত কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝগড়া হলো না, কারণ সবাই মাথা নেড়ে স্বীকার করল ছোটাচ্চুর মন খারাপ থাকার কোনো কারণ নেই। গুড্ডু মনে করিয়ে দিল ছোটাচ্চু এর মাঝে দুইবার তাদেরকে চায়নিজ আর একবার পিতজা খাওয়াতে নিয়ে গেছে।

আরেকজন বলল, "ডিসেম্বর মাসে কক্সবাজার নিয়ে যাবে।"

আরেকজন বলল, "জাল নোটের কেসটা শেষ করলে একটা গাড়ি কিনবে বলেছে—"

অন্যদেরও কিছু না বলার ছিল কিন্তু প্রমি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "সব ঠিক আছে। ছোটাচ্চুর খুবই ভালো অবস্থা, তার মন খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নাই। কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে, ছোটাচ্চুর মন খারাপ কেন? কেন ছোটাচ্চুর মন খারাপ? কী নিয়ে মন খারাপ?"

সবাই এবার চুপ করে গেল, তারপর সবাই আস্তে আস্তে টুনির দিকে তাকাল। এতক্ষণ সবাই কিছু না কিছু বলেছে, শুধু টুনি একটা কথাও বলেনি। সবাই জানে এই বাসায় ছোটাচ্চুর সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক টুনির, কখনো ভালো কখনো খারাপ কিন্তু কোনো একটা সম্পর্ক যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। সবাই টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। টুনি কিছু বলল না, তখন শান্ত জিজ্ঞেস করল, "টুনি, তুই কি কিছু জানিস, ছোটাচ্চুর কী হয়েছে?"

টুনি বলল, "উঁহু আমি জানি না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"অনুমান করতে পারি।"

একসাথে সবাই জিজ্ঞেস করল, "কী অনুমান করতে পারিস?"

টুনি তার চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে বলল, "আমার মনে হয় ছোটাচ্চুর সাথে ফারিহাপুর ব্রেক-আপ হয়ে গেছে।"

"কী হয়ে গেছে?"

"ব্রেক-আপ। ছাড়াছাড়ি। সেই জন্যে ছোটাচ্চুর মন খারাপ।"

"ছাড়াছাড়ি?" টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "বিয়ে করলে না ছাড়াছাড়ি হয়। তাদের তো বিয়ে হয় নাই।"

প্রমি টুম্পাকে বলল, "তুই ছোট, তুই এসব বুঝবি না।"

শান্ত বলল, "ব্রেক-আপ হয়েছে তো কী হয়েছে? আবার ফিক্স-আপ হয়ে যাবে। আর না হলে সমস্যা কী? দুনিয়াতে কি আপুদের অভাব আছে? ফারিহাপু চলে গেলে মালিহাপু আসবে। মালিহাপু চলে গেলে সাবিহাপু আসবে। সাবিহাপু চলে গেলে—"

প্রমি চোখে আগুন বের করে শান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "চুপ কর গাধা কোথাকার। তুই ব্যাটা ছেলে মানুষ, তুই এগুলো বুঝবি না।" তারপর টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "টুনি, তুই সত্যিই মনে করছিস ফারিহাপুর সাথে ছোটাচ্চুর ব্রেক-আপ হয়ে গেছে?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "আমি ঠিক জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় এইটাই কারণ।"

"তুই ঠিক জানিস?"

"না, কিন্তু বের করার জন্যে চেষ্টা করতে পারি।

সবাই তখন হইহই করে বলল, "এটা বের করো, এটা বের করো।" কাজেই গোলটেবিল বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো টুনি ছোটাচ্চুর কাছ থেকে বের করে আনবে ফারিহাপুর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াটাই ছোটাচ্চুর মন খারাপের কারণ কি না।

AMARBOI.COM

পরদিন সকালেই টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে হাজির হলো। ছোটাচ্চু বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে, পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে পা দুটো উঁচু করে রেখেছে। কোলে একটা মোটা বই, উঁকি দিয়ে বইয়ের নামটা পড়ার চেষ্টা করল, পড়তে পারল না, মনে হলো কঠিন জ্ঞানের একটা বই। মাথার কাছে ল্যাপটপে একটা গান বাজছে খুবই করুণ স্বরে। সেখানে একজন গান গাইছে, 'এই জীবন রেখে কী হবে মরে গেলেই ভালো' সেই রকম একটা গান।

টুনি দরজায় দাঁড়িয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে ভিতরে ঢুকে খুবই হাসি-খুশি গলায় ডাকল, "ছোটাচ্চু!"

ছোটাচ্চু একটু চমকে উঠে টুনির দিকে তাকাল, বলল, "কে? টুনি?"

কিছুই যেন হয়নি, সবকিছু যেন ভালোভাবে চলছে সেরকম ভান করে টুনি ছোটাচ্চুর বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, বলল, "কী হয়েছে জানো ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চুর মুখ দেখে বোঝা গেল 'কী হয়েছে'। সেটা নিয়ে ছোটাচ্চুর এতটুকু আগ্রহ নাই, মাছের মতো গোল গোল চোখ করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনি তার গলার মাঝে অনেকখানি উত্তেজনা নিয়ে বলল, "টুম্পার ছেলের সাথে রিংকুর মেয়ের বিয়ে।"

টুম্পার বয়স দশ রিংকুর আট, তাই তাদের ছেলে এবং মেয়ের বিয়ের খবরটি শুনে ছোটাচ্চুর ভুরু কুঁচকানো উচিত ছিল। ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকাল না, কথাটা মেনে নিয়ে বলল, "ও।" তারপর আবার বইটার দিকে তাকাল, পড়ার ভান করতে লাগল।

টুনি হাল ছাড়ল না, বলল, "টুম্পার ছেলে মানে বুঝেছ তো? টুম্পার একটা ছেলে পুতুল আছে, নাম রাজা।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

টুনি বলল, "রিংকুর মেয়ে পুতুল। নাম কী জানো?"

যে কোনো মানুষের বলা উচিত "রানি।" ছোটাচ্চু কিছু না বলে মাছের মতো তাকিয়ে রইল। টুনি নিজেই বলল, "বিনু।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

টুনি বলল, "ফ্যামিলির প্রথম বিয়ে সেই জন্যে সবার খুব উৎসাহ। প্রথমে পান-চিনি তারপর গায়ে হলুদ। তারপর আকত—সবার ইচ্ছা যে তুমি হবে উকিল বাবা।"

অন্য যে কোনো সময় হলে ছোটাচ্চু উকিল বাবা হওয়া কিংবা না হওয়া নিয়ে অনেক রকম কথা বলত, আজকে কিছুই বলল না। মাছের মতো চোখ করে তাকিয়ে রইল। টুনি তবু হাল ছাড়ল না, বলল, "বিয়েতে কাকে কাকে দাওয়াত দিব সেটার লিস্ট করেছে। বাইরে থেকে কাকে কাকে দাওয়াত দিবে জানো?"

ছোটাচ্চু জানার কোনো আগ্রহ দেখাল না, চোখের পাতি না ফেলে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। টুনি মুখে একটা সরল ভাব ধরে রেখে বলল, "বাইরে থেকে দাওয়াত দিবে ফারিহাপুকে—"

ছোটাচ্চু একেবারে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো করে চমকে উঠল, প্রথমবার চোখের পাতি ফেলল, পিটপিট করে বলল, "কী বললি?"

AMARBOI.COM

"আর মনে করো শায়কা খালাকে দাওয়াত দিতে পারি—"

"আগে কার নাম বলেছিস?"

টুনি কিছুই বুঝে না এরকম ভান করে বলল, "কেন? ফারিহাপু।"

ছোটাচ্চু বলল, "ফা—ফা—ফা—"

"হ্যাঁ। ফারিহাপু।"

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ মুখ হাঁ করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, টুনি একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "কোনো সমস্যা ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না, কোনো সমস্যা নাই।" তারপর হঠাৎ করে মাথা নাড়ানো থামিয়ে বলল, "ফারিহা?"

"হ্যাঁ। তুমি কি ফারিহাপুকে একটু বলে দেবে?"

ছোটাচ্চু কেমন যেন লাফ দিয়ে উঠল, বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আর কে বলবে?"

ছোটাচ্চুর মুখ দেখে মনে হলো ছোটাচ্চু এখনো বুঝি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারে নাই, আবার বলল, "আমি?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। তুমি।" টুনি এদিক-সেদিক তাকাল, বিছানার উপর ছোটাচ্চুর মোবাইল ফোনটা ছিল, সেটা হাতে নিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও ছোটাচ্চু। ফারিহাপুকে একটা ফোন করো।"

ছোটাচ্চু আবার বসে থেকে একটা ছোট লাফ দিল, বলল, "ফোন করব? আমি? এখন?"

"হ্যাঁ। সমস্যা কী?"

"কিন্তু কিন্তু কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

ছোটাচ্চু বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছাদের দিকে তাকাল তারপর বলল, "আমি পারব না।"

"তুমি পারবে না?"

"না।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কেন পারবে না ছোটাচ্চু?"

"ফারিহার সাথে আমার ব্রেক-আপ হয়ে গেছে।"

ছোটাচ্চু কী বলেছে বুঝতে টুনির কোনো সমস্যা হলো না কিন্তু তারপরেও জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"ব্রেক-আপ। ফারিহার সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নাই। নো কানেকশান। নাথিং।"

টুনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু বলল, "উঁ।"

"কে ব্রেক-আপ করেছে? তুমি না ফারিহাপু?"

ছোটাচ্চু টুনির দিকে কেমন জানি ঘোলা চোখে তাকাল, তারপরে বলল, "কীভাবে কীভাবে জানি হয়ে গেল। আমি একটু বলেছি তারপর ফারিহা তারপর আবার আমি। মাথা গরম করে তখন আবার ফারিহা বলল, বাংলা সাহিত্যে এখনো উত্তর আধুনিক কবিতা লেখা হয় নাই। আমি বললাম হয়েছে—"

"কী কবিতা?"

"উত্তর আধুনিক মানে পোস্ট মডার্ন।"

"তুমি কী বললে?"

"আমি বলেছি অবশ্যই হয়েছে। ফারিহা বলেছে হয় নাই। বলেছে এইগুলো ইউরোপিয়ান ঢং—" ছোটাচ্চুর নাকটা কেমন যেন ফুলে উঠল, বলল, "ফারিহার কত বড় অডাসিটি।"

"কী সিটি?"

"অডাসিটি। মানে দুঃসাহস। কত বড় দুঃসাহস সে এই দেশের পোস্ট মডার্ন মুভমেন্টকে অস্বীকার করে—" ছোটাচ্চু তার নাক ফুলিয়ে মডার্ন পোস্ট মডার্ন-এর পার্থক্য নিয়ে কথা বলতে লাগল। টুনি কিছু বুঝল, বেশিরভাগই বুঝল না। ধৈর্য ধরে কথাগুলো শুনল, তারপর বলল, "ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু বলল, "উঁ।"

"তুমি মডার্ন পোস্ট মডার্ন নিয়ে ঝগড়া করে ফারিহাপুর সাথে ব্রেক-আপ করেছ? তোমার মাথার মাঝে ঘিলু বলে কিছু নাই।"

"কী বললি?"

"আমি বলেছি তুমি হচ্ছ চূড়ান্ত বোকা। ফারিহাপুর মতো সুইট মেয়ে দুনিয়াতে আছে? ফারিহাপুর মতো স্মার্ট মেয়ে দুনিয়াতে আছে?

ফারিহাপুর সাথে এক মিনিট কথা বললে আমাদের মন ভালো হয়ে যায়। আর তুমি ফারিহাপুর সাথে মডার্ন পচা মডার্ন নিয়ে ঝগড়া করো—"

"পচা মডার্ন না। পোস্ট মডার্ন।"

"একই কথা।"

ছোটাচ্চু গর্জন করে বলল, "এক কথা না।"

টুনি ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন তুমি এটা নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে?"

ছোটাচ্চু কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। একটু আঁ-উঁ করে থেমে গেল। টুনি থমথমে গলায় বলল, "ছোটাচ্চু।"

"কী?"

"তোমাকে একটা কথা বলি?"

"বল।"

"তুমি এক্ষুনি ফারিহাপুর কাছে গিয়ে বলো তোমার ভুল হয়ে গেছে! আর কখনো তুমি ঝগড়া করবে না।"

ছোটাচ্চু গর্জন করে উঠল, বলল, "নেভার। তুই জানিস ফারিহা আমাকে কী বলেছে? বলেছে আমি নাকি ব্রেন ডেড। কত বড় সাহস!"

টুনি ছোটাচ্চুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ছোটাচ্চু। মানুষ রাগের মাথায় অনেক কিছু বলে, তুমি সব সময় রেগেমেগে আমাদের একশ' একটা গালি দাও। তাই রাগ করে কী বলে সেইটা শুনতে হয় না। আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে, ফারিহাপু তোমাকে যদি ব্রেন ডেড বলে থাকে ঠিকই বলেছে। তুমি আসলেই ব্রেন ডেড। তা না হলে কেউ কখনো ফারিহাপুর মতোন এরকম ফাটাফাটি একটা মেয়ের সাথে ঝগড়া করতে পারে? পারে না।"

ছোটাচ্চু গরম হয়ে বলল, "দেখ টুনি। ভালো হবে না কিন্তু—"

টুনি টের পেল ছোটাচ্চুর গলায় বেশি জোর নেই, তাই কথা থামাল না, বলল, "ফারিহাপুর সাথে ব্রেক-আপ করে তোমার কী লাভ হয়েছে? তোমার খাওয়া নাই, ঘুম নাই, তোমার চোখের নিচে কালি, তোমার মুখে বিন্দি বিন্দি দাড়ি, তোমার চুল আউলা-ঝাউলা—তুমি অফিসে যাও না, তোমার কাজকর্ম বন্ধ! আমাদের সবাই মিলে তোমাকে চোখে চোখে রাখতে হয় কখন তুমি সুইসাইড করে ফেলো—"

টুনির শেষ কথাটা অবশ্যি সত্য নয়, ছোটাচ্চু সুইসাইড করে ফেলবে সেটা তারা কখনো ভাবেনি। তারা সবাই মিলে ছোটাচ্চুকে চোখে চোখে রাখছে সেটাও ঠিক না। কিন্তু কথা বলার সময় একটু বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বলতে হয়, তা না হলে কথার মাঝে জোর হয় না।

টুনি ভেবেছিল ছোটাচ্চু আপত্তি করে কিছু একটা বলবে কিন্তু কিছু বলল না, ছাদের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। টুনি গলার স্বর আরো গম্ভীর করে বলল, "ছোটাচ্চু, ফারিহাপু ছাড়া তুমি বাঁচবে না। আমরাও ফারিহাপু ছাড়া আর কাউকে চাই না! তাই তোমাকে আমরা দুই দিন সময় দিচ্ছি। এর মাঝে তোমাকে ফারিহাপুর সাথে মিলমিশ করে নিতে হবে।"

ছোটাচ্চু কেমন যেন ঘোলা চোখে টুনির দিকে তাকাল, তারপর বলল, "টুনি তুই ছোট, তুই বুঝবি না। বিষয়টা এত সোজা না যে বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে আড়ি দিয়েছিলাম এখন কেনে আঙুল ছুঁয়ে ভাব করে ফেলব। বিষয়টা জটিল। মানুষের সম্পর্ক হচ্ছে কাচের গ্লাসের মতো, একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না। সুপার গ্লু দিয়ে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করা যায় কিন্তু সেটা শুধু আটকে রাখে জোড়া হয় না—" কথা শেষ করে ছোটাচ্চু এমন লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল যে মনে হলো বুকের ভেতর থেকে একটা সাইক্লোন বের হয়ে টর্নেডোর মতো ঘরে ঘুরপাক খেতে লাগল।

টুনি ছোটাচ্চুকে দেখে খুব মন খারাপ করে বের হলো। বড় মানুষদের মাথার মাঝে ঘিলু এত কম কেন?

সেদিন বিকালে আবার একটা গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলো, আগের মতোই সবাই মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসেছে। সবার মুখ একটু গম্ভীর, একটু আগে টুনির মুখ থেকে সবাই পুরোটুকু শুনেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত বলল, "অবস্থা ঘনঘটিয়াস।"

ঘনঘটিয়াস শব্দটার অর্থ কেউ জানে না, ধরে নিল এর অর্থ গুরুতর। কেউ কোনো কথা বলল না। তখন শান্ত আবার বলল, "এখন কী হবে?"

টুম্পা বলল, "এখন ছোটাচ্চু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। বিশ বছর পর ফিরে আসবে। তখন ছোটাচ্চুর এই এই লম্বা চুল আর দাড়ি থাকবে।"

গুড্ডু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, বলল, "সত্যি। আমি পড়েছি।"

গুড্ডু বলল, "কোথায় পড়েছ?"

টুম্পা উত্তর দেবার আগেই শান্ত বলল, "কোথায় আবার—স্কুলের বাথরুমের দেওয়ালে।"

টুম্পা মুখ শক্ত করে বলল, "না। আমি এইটা বাথরুমের দেওয়ালে পড়ি নাই। আমি পড়েছি—"

প্রমি হাত তুলে বলল, "তোরা থামবি? সারাক্ষণ ফালতু কথাবার্তা।"

শান্ত বলল, "মোটেও ফালতু কথাবার্তা না।"

"এখন কী করা যায় সেটা বলবি কেউ?"

সবাই আবার টুনির দিকে তাকাল, একজন জিজ্ঞেস করল, "কী করা যায় বলবি?"

টুনি চশমাটা নাকের উপর ঠিক করে বসিয়ে বলল, "আমি শুধু ছোটাচ্চুর কথাটা শুনেছি। ফারিহাপুর কথা শুনি নাই। দুইজনের কথাই শুনলে কী করা যায় সেটা চিন্তা করা যেত।"

প্রমি জিজ্ঞেস করল, "ফারিহাপুর কথা কেমন করে শুনবি? ফোনে কথা বলবি?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। এইসব কথাবার্তা টেলিফোনে হয় না, সামনাসামনি করতে হবে।"

"কীভাবে করবি?"

"জানি না।"

ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলাটা সহজ ছিল, সোজাসুজি তার ঘরে চলে গেছে। ফারিহাপুর কাছে তারা কেমন করে যাবে? কে যাবে? কী বলবে?

ঠিক তখন এই ঘরটাতে ঝুমু খালা উঁকি দিল, এতজনকে এভাবে বাস থাকতে দেখে সন্দেহের গলায় বলল, "ব্যাপারটা কী? তোমাদের মতলবটা কী?"

শান্ত বলল, "আমাদের কোনো মতলব নাই।"

"খামোখা মিছা কথা না বলে সত্যি কথাটা কও। মতলবটা বদ-মতলব কি না এইটা বললেই হবে।"

AMARBOI.COM

টুম্পা মুখ শক্ত করে বলল, "মোটেও বদ-মতলব না। আমরা ছোটাচ্চুকে নিয়ে কথা বলছি।"

ঝুমু খালা জিজ্ঞেস করল, "কী কথা?"

"ছোটাচ্চুর অনেক মন খারাপ, কেমন করে তার মন খারাপ দূর করা যায় সেইটা নিয়ে কথা বলছিলাম।"

"এইটা নিয়ে আবার কথা বলার কী আছে? ধইরা বিয়া দিয়ে দাও সব মন খারাপ দূর হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে জটিল রোগের সোজা চিকিৎসা।"

এবারে কেউ কোনো কথা বলল না। ঝুমু খালা বলল, "তার তো মেয়ে ঠিক আছে! লম্বা মতন হাসি-খুশি মাইয়াটা—ফাজিলা না যেন কী নাম—"

"ফারিহা।"

"হ্যাঁ। ফারিহা। চাচিরে কও বিয়ার প্রস্তাব দিতে—"

প্রমি গম্ভীর গলায় বলল, "ছোটাচ্চু আর ফারিহাপুর ব্রেক-আপ হয়ে গেছে।"

ঝুমু খালার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, বলল, "কও কী! বেরেক আপ? মানে ছাড়াছাড়ি?"

"হুঁ।"

ঝুমু খালার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। সে এবারে ঘরের ভেতর ঢুকে তাদের পাশে বসে পড়ল, হাতের ঝাড়ুটা পতাকার মতো ধরে রেখে বলল, "কী সর্বনাশা কথা! এখন কী হবে?"

প্রমি বলল, "সেই জন্যে আমরা সবাই বসেছি। কী করা যায় সেইটার কথা বলছি।"

ঝুমু খালার বুদ্ধির উপর শান্তর অনেক বেশি ভরসা। সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোনো আইডিয়া আছে ঝুমু খালা?"

ঝুমু খালা বলল, "এইটা আইডিয়ার ব্যাপার না। মিল-মহব্বত আইডিয়া দিয়া হয় না।"

"তাহলে কী দিয়ে হয়?"

"আমাগো গেরামে জরিনি বেওয়া থাকে। কমপক্ষে একশ' চল্লিশ বছর বয়স। চোখে দেখে না, কানে শুনে না। মাথার চুল শণের মতো

AMARBOI.COM

সাদা। শরীরের চামড়ায় কুঁচ পড়েছে, মুখে দাঁত নাই, খালি মাড়ি। সেই জরিনি বেওয়া পান পড়া দেয়, সেই পান পড়া যদি একবার খাওয়াতে পারো দেখবা মিল-মহব্বত কারে কয়। একটা খাওয়াবা তোমার ছোটাচ্চুরে আরেকটা খাওয়াবা ফাজিলারে—"

"ফাজিলা না। ফারিহা।"

"ঐ একই কথা।" ঝুমু খালা বলল, "যদি দুইজনরে দুইটা পান পড়া খাওয়াতে পারো দেখবা পাগলের মতো দুইজন ছুইটা আসবে—"

টুনি বলল, "ঝুমু খালা, আমার মনে হয় এইটা পান পড়া দিয়ে হবে না।"

ঝুমু খালা তার ঝাড়ুটা মেঝেতে ঠুকে বলল, "একশ'বার হবে। হাজারবার হবে। জরিনি বেওয়ার পান পড়া কী চিজ, তোমরা জানো না।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু আমরা তো জরিনি বেওয়ার কাছে যেতে পারব না। আমাদের অন্য কিছু করতে হবে।"

ঝুমু খালা মেনে নিল। মাথা নেড়ে বলল, "সেইটা ভুল বলো নাই। সেইটা সত্য কথা। অন্য সিস্টিম করতে হবে।" সবাই দেখল ঝুমু খালা ঝাড়ুটা সামনে শুইয়ে রেখে অন্য সিস্টিম চিন্তা করতে শুরু করেছে।

এই বাসার ছেলেমেয়েরা ঝুমু খালার কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনাকে খুব গুরুত্ব দেয়। তাই সবাই কোনো শব্দ না করে ঝুমু খালাকে চিন্তা করতে দিল। ঝুমু খালা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করে চোখ খুলে বলল, "তোমাদের ছোটাচ্চুর মনরে কেমন করে নরম করা যাবে সেইটা এখন বলতে পারব না। তবে—"

সবাই ঝুঁকে পড়ল, "তবে?"

ঝুমু খালা মুখ গম্ভীর করে বলল, "ফাজিলার মন কেমন করে নরম করা যাবে সেইটা বলতে পারি।"

"ফাজিলা না, ফারিহা।"

"একই কথা।"

টুনি জানতে চাইল, "কী রকম করে?"

"তোমার ছোটাচ্চুর একটা কঠিন ব্যারাম দরকার। কঠিন অসুখ।"

"অসুখ?"

"হ্যাঁ। যেমন মনে করো কলেরা। না হলে যক্ষ্মা।"

বাচ্চারা চমকে উঠল, "কলেরা? যক্ষ্মা?"

ঝুমু খালা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। যখন তোমার ছোটাচ্চু অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে সেই খবর যখন ফাজিলা পাবে—"

"ফারিহা।"

"হ্যাঁ ফারিহা। যখন খবর পাবে তখন তার মনের মাঝে একটা দরদ হবে। তখন ঝগড়া-ঝাঁটি ভুলে চলে আসবে। মহব্বত ফিরে আসবে, মিলমিশ হয়ে যাবে।"

শান্তকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু ছোটাচ্চুর অসুখ কেমন করে বানাব? কলেরা না হলে যক্ষ্মার জীবাণু আনতে হবে?"

ঝুমু খালা বলল, "মনের মতন অসুখ পাওয়া কঠিন। তবে আরেকটা কাজ করা যায়।"

"কী কাজ?"

"ঠ্যাং ভেঙে দিতে পারলেও কাজ হয়।"

সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠল, "ঠ্যাং ভেঙে দিব?"

ঝুমু খালা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। ঠ্যাং ভেঙে যদি বিছানায় শোয়াইয়া রাখো, তাহলেও কাজ হবে। কলেরা না হলে যক্ষ্মার সমান কাজ হবে। জরিনি বেওয়ার পান পড়া হলো এক নম্বর। ঠ্যাং ভাঙা হলো দুই নম্বর।"

ঝুমু খালা চলে যাওয়ার পর সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। টুম্পা উশখুশ করে বলল, "তাহলে আমরা কি ছোটাচ্চুর পা ভাঙব?"

শান্ত বলল, "আমি চেষ্টা করতে পারি। সিঁড়ির উপর একটা কলার ছিলকা রেখে হাল্কা মতন ধাক্কা দিলে—"

প্রমি ধমক দিয়ে বলল, "তুই চুপ করবি? একজন মানুষের পা আবার কেমন করে ভেঙে দেয়? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

শান্ত মিনমিন করে বলল, "কিন্তু ঝুমু খালা যে বলল!"

"ঝুমু খালা বললেই সেটা করতে হবে?"

"তাহলে কি কলেরা হাসপাতাল থেকে কলেরার জার্ম আনতে হবে?"

টুনি বলল, "আমার মনে হয় কী—"

সবাই টুনির দিকে ঘুরে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "কী মনে হয়?"

"ঝুমু খালা কথাটা ভুল বলে নাই।"

"ভুল বলে নাই?"

"না। আমাদের ক্লাশে একটা ছেলে পড়ে, তার নাম হচ্ছে খলিল। খলিলের থেকে পাজি ছেলে এখন পর্যন্ত জন্মায় নাই। ক্লাশের কেউ তাকে দুই চোখে দেখতে পারে না। সবার সাথে ঝগড়া, মারামারি। খলিল খালি দুষ্টু না, দুষ্টু আর পাজি। একদিন হঠাৎ—"

"হঠাৎ কী?"

"আমরা খবর পেলাম রিকশা একসিডেন্ট করে পা ভেঙে হাসপাতালে। তখন ক্লাশের সবাই বলতে শুরু করল, আহা বেচারা খলিল! সবাই তখন খলিলকে দেখতে হাসপাতালে গেল। তারে দেখে সবার কী যে মায়া হলো! কেউ খলিলের মাথা টিপে দেয়, কেউ হাত টিপে দেয়, কেউ বাতাস করে, কেউ দুধ খাওয়ায়—"

প্রমি মাথা নাড়ল, বলল, "তোর কথা ঠিক। মেয়েদের ভিতরে মায়া বেশি। কারো অসুখ হয়েছে শুনলে মায়া অনেক বেশি হয়। ছোটাচ্চুর যদি বড় কোনো অসুখ হতো তাহলে মনে হয় ফারিহাপু নরম হয়ে যেত। কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি বড় অসুখ বানানো যাবে?"

টুনি বলল, "না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"সত্যি সত্যি অসুখ হতে হবে কে বলেছে? আমরা ফারিহাপুকে গিয়ে বলি ছোটাচ্চু খুবই অসুস্থ—"

"আর ফারিহাপু যদি এসে দেখে কোনো অসুখ নাই?"

টুনি মাথা চুলকে বলল, "আমরা এমন একটা অসুখের কথা বলব যেটা হলে বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। মনে হয় পুরোপুরি সুস্থ—"

একজন বলল, "পেটের অসুখ?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। পেটের অসুখের মাঝে সম্মান নাই। সম্মানী অসুখ হতে হবে।"

"সম্মানী অসুখ কোনটা?"

"হার্ট এটাক। ব্রেন স্ট্রোক এগুলো সম্মানী অসুখ। সব বড়লোকদের এই অসুখ হয়। গরিবের পেটের অসুখ হয়।"

"ছোটাচ্চুর হার্ট এটাক হবে? ব্রেন স্ট্রোক?"

টুনি মাথা নাড়ল, "উঁহু। এইগুলো হাসপাতালে নিতে হয়।"

"তাহলে?"

"চিন্তা করে একটা বের করা যাবে। ইন্টারনেটে গুগল সার্চ দিলেই বের হয়ে যাবে।"

প্রমি জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ফারিহাপুর কাছে কে যাবে? কেমন করে যাবে? গিয়ে কীভাবে বলবে?"

টুনি বলল, "চিন্তা করে ঠিক করতে হবে। আমাদেরকে এমনি এমনি যেতে দিবে না, আব্বু-আম্মুকে বলার জন্যে একটা ভালো স্টোরি বানাতে হবে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"ছোটাচ্চু উত্তর আধুনিক না কি একটা নিয়ে বকাবকি করছিল। গণ্ডগোলটা লেগেছে সেখান থেকে। সেইটাও একটু বুঝতে হবে।"

শান্ত মুখ হাঁ করে বলল, "উত্তর আধুনিক? সেটা আবার কী?"

"এক রকম কবিতা।"

"কবিতার উত্তর-দক্ষিণ আছে?"

টুনি মাথা নাড়ল, "আমি জানি না। ছোটাচ্চু বলে উত্তর আধুনিক কবিতা আছে ফারিহাপু বলে নাই—সেই থেকে গোলমাল!"

"কী আশ্চর্য!" প্রমি চোখ কপালে তুলে বলল, "এটা আবার কী রকম কথা। থাকলে আছে না থাকলে নাই, এ জন্যে ঝগড়া করতে হবে?"

টুনি বলল, "এই হচ্ছে বড়দের সমস্যা। একজন মানুষ যখন বড় হতে থাকে তখন তাদের মাথায় ঘিলু কমতে থাকে! তুমি যখন বড় হবে তখন তুমিও আস্তে আস্তে বোকা হয়ে যাবে।"

সবাই মাথা নাড়ল, শান্ত পর্যন্ত কথাটা মেনে নিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছিস! আমিও দিনে দিনে বোকা হয়ে যাচ্ছি। আগে মেয়েদের দেখলে মেজাজ গরম হতো। আজকাল মেয়েদের দেখলে কেমন যেন ইয়ে—"

সবাই শান্তর দিকে ঘুরে তাকাল। প্রমি চোখ পাকিয়ে বলল, "কেমন যেন কিয়ে?"

শান্ত জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না—সেরকম কিছু না।"

টুনি নিঃশ্বাস ফেলে নিচু গলায় বলল, "শান্ত ভাইয়ার হরমোন কিক করতে শুরু করেছে মনে হয়!"

পরের দিন টুনি আর প্রমি ফারিহাপুর সাথে দেখা করতে গেল। কাজটা খুব সহজ হলো না, স্কুল ছুটির পর বন্ধুর বাসায় যাওয়া, ছবি আঁকার ক্লাশ, লাইব্রেরি থেকে বই আনা, সায়েন্স খাতা কেনা—এরকম বেশ কিছু ব্যাপারকে একসাথে সাজাতে হলো। বড় মানুষেরা একটু বোকা হয়, তাই খুব বেশি কঠিন হলো না। সেই তুলনায় ফারিহাপুর অফিসটা কোথায় সেটা বের করা মোটামুটি কঠিন কাজ ছিল, ছোটাচ্চুকে না জানিয়ে কাজটি করতে হয়েছে তাই কাজটি আরো কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত প্রমি আর টুনি ফারিহাপুর অফিসে গিয়ে হাজির হলো দুপুরবেলা। ফারিহাপু অফিসে তার চেয়ারে বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল, টুনি আর প্রমি তার সামনে এসে দাঁড়ানোর পরও কিছুক্ষণ তাদের দেখতে পেল না! টুনি যখন গলা পরিষ্কার করে ডাকল, "ফারিহাপু", তখন চোখ নামিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, বলল, "আরে! তোমরা?"

টুনি বলল, "হ্যাঁ ফারিহাপু। আমরা তোমার কাছে এসেছি।"

"আমার কাছে?" ফারিহাপু টুনির কথা শুনে একটু অবাক হলো কিন্তু সেটা তাদের বুঝতে দিল না, বলল, "বসো, বসো।"

টুনি আর প্রমি সামনের চেয়ারে বসল। কীভাবে কথা শুরু করবে বুঝতে পারছিল না, ফারিহাপু অবশ্যি ভাব দেখাল যেন ছোটাচ্চুর সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পর ছোটাচ্চুর ভাগনি-ভাইঝির তার কাছে চলে আসা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তারপর, তোমাদের কী খবর?"

দুইজনে মাথা নেড়ে বলল, "ভালো। খুবই ভালো।"

amarboi.com

"গুড। ভেরি গুড।"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "আপনার অফিস কেমন চলছে?"

ফারিহাপু গলা নামিয়ে বলল, "ফালতু, খুবই ফালতু।"

"কেন? ফালতু কেন?"

"এইটা একটা এনজিও, গরিব বাচ্চাদের সাহায্য করার এনজিও। সাহায্য না কচু—গরিব বাচ্চাদের নিয়ে বিজনেস করে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। চাকরি ছেড়ে দেব।"

"চাকরি ছেড়ে কী করবেন?"

"আর কোনো একটা চাকরি খুঁজে বের করব।"

টুনি মনে মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোটাচ্চুর আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে যদি ফারিহাপু আর ছোটাচ্চু দুইজন মিলে কাজ করত, কী মজাই না হতো। দুইজনে ঝগড়া করে এখন ঘাপলা করে রেখেছে। টুনি তার চশমাটা ঠিক করে গলা পরিষ্কার করে বলল, "ফারিহাপু, আমরা তোমাকে একটা দাওয়াত দিতে এসেছি।"

ফারিহাপু একটু অবাক হয়ে বলল, "দাওয়াত?'

"হ্যাঁ।"

"কিসের দাওয়াত?"

"বিয়ের দাওয়াত।"

"বিয়ের?" ফারিহাপুর চেহারাটা হঠাৎ কেমন জানি শীতল হয়ে উঠল, ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কার বিয়ে?"

"টুম্পার ছেলের সাথে রিংকুর মেয়ের বিয়ে?"

"টু-টুম্পাটা কে? রিংকু কে?"

প্রমি বলল, "আমাদের ছোট বোন। তাদের আসল ছেলে-মেয়ে না, তাদের পুতুলের বিয়ে।"

ফারিহাপুর কয়েক সেকেন্ড লাগল বুঝতে, তখন তার চেহারাটা আবার স্বাভাবিক হলো। তারপর হি হি করে হাসতে লাগল! হাসতে হাসতে বলল, "বৃষ্টি না হলে ব্যাঙের বিয়ে দেয় বলে শুনেছি। কিন্তু পুতুলের বিয়ে—এইটা অনেক দিন শুনিনি।"

AMARBOI.COM

প্রমি বলল, "তোমাকে যেতেই হবে ফারিহাপু। সবাই খুব চাইছে।"

এবারে আস্তে আস্তে ফারিহাপুর মুখটা কেমন যেন দুঃখী দুঃখী হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর নিজের নখগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল, সেটা মোটেও হাসির মতো হলো না, তারপর টেবিলে ঠোকা দিতে দিতে বলল, "আসলে, ব্যাপারটা হয়েছে কী, আমি আসলে তোমাদের বাসায় যেতে পারব না। মানে—আসলে আমার না যাওয়াটাই ভালো।"

প্রমি আর টুনি খুব অবাক হবার ভান করল, বলল, "কেন?"

ফারিহাপু বলল, "তোমরা তো ছোট, তোমাদের ঠিক করে বোঝাতে পারব না। মানে তোমরা তো জানতে তোমাদের ছোটাচ্চু আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল।"

দুইজনে জোরে জোরে মাথা নাড়ল। ফারিহাপু বলল, "ছোট বেলার বন্ধুত্ব একরকম, যখন মানুষ বড় হয়, ছেলে আর মেয়ের যদি বন্ধুত্ব হয় তখন অনেক সময় বন্ধুত্বটা আরো একটু গভীর হয়, বড় বড় কমিটমেন্টের ব্যাপার আসে—"

ফারিহাপুর কথা আস্তে আস্তে জটিল এবং দুর্বোধ্য হতে শুরু করেছে কিন্তু টুনি আর প্রমি সব বুঝে ফেলছে সেরকম ভান করে মাথা নাড়তে থাকল। ফারিহাপু বলল, "যদি বড় কমিটমেন্টে যেতে হয় তখন আরো ডিটেইলস চলে আসে। দুজন মানুষই যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, ভেল্যুজ যদি খুব স্ট্রং হয় ছোটখাটো ইস্যু ক্রিটিকাল হয়ে যায়—"

ফারিহাপু কী বলছে প্রমি আর টুনি কিছুই বুঝতে পারছে না কিন্তু তারা সবকিছু বুঝে ফেলছে সেরকম ভান করে আরো জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকল। ফারিহাপু বলল, "কিন্তু ছোটখাটো ইস্যু আসলে ছোটখাটো না, এগুলো একজন মানুষের পার্সোনালিটি দেখায়। বন্ধুত্বের বেলায় পার্সোনালিটির উনিশ-বিশে কিছু আসে যায় না। কিন্তু বড় কমিটমেন্টের বেলায় এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ কী গান শুনে, কার ছবি দেখে, প্রিয় লেখক কে—"

বড় মানুষদের এটা হচ্ছে সমস্যা—একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামতে পারে না। কাজেই ফারিহাপু কথা বলতেই থাকল, বেশিরভাগ জিনিস টুনি বুঝতে পারল না, প্রমি যেহেতু একটু বড় হয়েছে তাই সে হয়তো একটু একটু বুঝল কিন্তু ফারিহাপুর থামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। যখন মাঝখানে একটু থামল তখন টুনি বলল, "কিন্তু আমরা ভাবছিলাম তুমি আমাদের বিয়েতে আসবে, ছোটাচ্চুকে একটু দেখেও আসবে, ছোটাচ্চুর এত শরীর খারাপ—"

ফারিহাপু এবারে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে শাহরিয়ারের?"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না তাই বোঝা যাচ্ছে না। ব্লাড ক্যান্সার সন্দেহ করছে।"

"ফারিহাপু একেবারে চিৎকার করে উঠল, "ব্লাড ক্যান্সার?"

টুনি বুঝল একটু বেশি হয়ে গেছে, এত কঠিন অসুখের কথা বলা ঠিক হয় নাই। কিন্তু এখন আর কিছু করার উপায় নাই—এভাবেই এগুতে হবে! সে মুখ শুকনো করে বলল, "খাওয়ার রুচি নাই, রাতে করে জ্বর ওঠে। সেই দিন—" টুনি ইচ্ছা করে থেমে গেল।

"সেই দিন কী?"

"নাহ্, কিছু না।" টুনি ইচ্ছে করে ভান করল যে, সে কিছু একটা জিনিস ফারিহাপুর কাছে লুকানোর চেষ্টা করছে।

ফারিহাপু হঠাৎ করে শোনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেল, বলল, "সেই দিন কী হয়েছে বলো?"

টুনি বলল, "আমি ছোটাচ্চুর ঘরের কাছে দিয়ে যাচ্ছি—ছোটাচ্চু ঘুমিয়ে আছে, আমার মনে হলো ছোটাচ্চু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে, আমার মনে হয় কথাগুলো শোনা ঠিক হয় নাই। ঘুমের মাঝে তো একজন কত কথাই বলতে পারে।" টুনি আবার থেমে গেল।

ফারিহাপু জিজ্ঞেস করল, "কী বলছিল ঘুমের মাঝে?"

"তোমার নাম।"

"আমার নাম?" ফারিহাপুর গাল দুটো মনে হলো একটু লাল হয় উঠল।

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ। আর বলছিল, আমি ভুল করেছি ফারিহা, তুমিই ঠিক।"

ফারিহাপু একটু ঝুঁকে পড়ল, "তাই বলছিল? কী ভুল করেছে?"

"কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারি নাই। মনে হলো উত্তর আধুনিক কী যেন—"

ফারিহাপু বলল, "উত্তর আধুনিক কবিতা। পোস্ট মডার্ন পোয়েট্রি।"

"হবে হয়তো।" টুনি মুখ গম্ভীর করে বলল, "বলছিল, নাই নাই বাংলা সাহিত্যে নাই—"

"তাই বলছিল?"

"হ্যাঁ। তারপর বিড়বিড় করে কিছু খারাপ জিনিস বলল।"

ফারিহাপু জিজ্ঞেস করল, "কী খারাপ জিনিস?"

বলল, "ডেড। আমি ডেড। ব্রেন ডেড। বারবার বলল, ব্রেন ডেড।"

ফারিহাপু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে রইল। তখন প্রমি বলল, "আমরা আজকে যাই ফারিহাপু। তোমার অফিসের সময় নষ্ট হচ্ছে।"

ফারিহাপু বিড়বিড় করে বলল, "কচু অফিস। ভুয়া অফিস। ফাউ অফিস। অফিসের খেতা পুড়ি।"

টুনি আর প্রমি উঠে দাঁড়াল, "আমরা যাই।"

ফারিহাপু অন্যমনস্কভাবে বলল, "ঠিক আছে যাও।"

প্রমি বলল, "তুমি যদি টুম্পা-রিংকুর পুতুলের বিয়েতে আসো, সবাই খুব খুশি হবে।"

টুনি বলল, "তুমি যদি চাও তাহলে আমরা ছোটাচ্চুকে ব্যস্ত রাখতে পারি, যেন তোমার সাথে দেখা না হয়।"

ফারিহাপু কোনো কথা বলল না, ছোটাচ্চু যেরকম মাছের মতো তাকিয়ে থাকে অনেকটা সেইভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। টুনি বলল, "আর যদি তোমার সাথে দেখা হয়ে যায় তুমি প্লিজ অসুখের কথা জিজ্ঞেস কোরো না।"

ফারিহাপু এবারেও কোনো কথা বলল না। টুনি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে মুখ কালো করে বলল, "কাউকে নিজের অসুখের কথা

বলতে চায় না। অসুখটা মনে হয় খুব ডেঞ্জারাস—ছোটাচ্চু মনে হয় বেশি দিন বাঁচবে না।"

প্রমি আর টুনি রাস্তায় নামার পর প্রমি টুনির ঘাড় খামচে ধরে বলল, "আমি জীবনে তোর মতো মিথ্যুক দেখি নাই। চোখের পাতি না ফেলে তুই এতগুলো মিথ্যা কথা কেমন করে বললি?"

টুনি বলল, "এইগুলো মিথ্যা কথা না। এইগুলো ছোটাচ্চু আর ফারিহাপুকে একত্র করার জন্যে একটা প্রজেক্ট।"

প্রমি মাথা নাড়ল, "তুই যাই বলিস, তোর মতো ডেঞ্জারাস মানুষ এই দুনিয়ায় নাই। যদি ফারিহাপু আর ছোটাচ্চু আসল ব্যাপারটা জানতে পারে তাহলে কী হবে চিন্তা করতে পারিস? তোকে তো খুন করেই ফেলবে আমাদের সবাইকেও খুন করে ফেলবে।"

টুনি বলল, "সেইটা পরে দেখা যাবে। এখন ভালো করে একটা পুতুলের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বাসায় পুতুল আছে না?"

প্রমি বলল, "খুঁজলে পাওয়া যাবে। সব অবশ্যি মেয়ে পুতুল, চুল কেটে ছেলে বানাতে হবে।"

AMARBOI.COM

বিকালবেলা টুনি ছোটাচ্চুর সাথে দেখা করতে গেল। ছোটাচ্চু তার সেই মোটা বইটা নিয়ে বসে আছে, খুব বেশি পড়া হয়েছে বলে মনে হয় না। টুনি আজকে বেশি ভূমিকার দিকে গেল না, সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো, বলল, "আজ সকালে ফারিহাপুর কাছে গিয়েছিলাম।"

মনে হলো কেউ ছোটাচ্চুকে দশ হাজার ভোল্ট দিয়ে ইলেকট্রিক শক দিয়েছে! ছোটাচ্চু বিছানার মাঝে বসে থেকেই একটা লাফ দিল, প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "কার কাছে গিয়েছিলি?"

"ফারিহাপুর কাছে।"

"কেন?"

"মনে নাই টুম্পার ছেলের সাথে রিংকুর মেয়ের বিয়ে? তুমি উকিল বাবা! ফারিহাপুকে বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়েছিলাম।"

ছোটাচ্চু বলল, "ফা—ফা—ফা—" কথা শেষ করতে পারল না কিন্তু টুনি অধৈর্য হলো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ছোটাচ্চু শেষ পর্যন্ত "ফারিহা" উচ্চারণ করতে পারল, বলল, "ফারিহা আসবে?"

"মনে হলো আসতে চাচ্ছে—কিন্তু তুমি আবার কী মনে করো।"

ছোটাচ্চু ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমি আবার কী মনে করব?"

"দেখলাম খুবই মন খারাপ।"

"মন খারাপ? কী নিয়ে মন খারাপ?"

"মনে হয় তোমার সাথে ব্রেক-আপ হয়ে গেছে সেই জন্যে।"

"সত্যি?" ছোটাচ্চুর চোখ কেমন যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

"হ্যাঁ।" টুনি উদাসীন একটা ভাব করে বলল, "অনেক কথা বলল।"

"কী কথা?"

"সব কথা তো আমি বুঝি না। যেমন ধরো, উত্তর আধুনিক কবিতা।"

ছোটাচ্চু নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, "কী বলেছে উত্তর আধুনিক কবিতার কথা?"

"বলছিল গত কিছুদিন অনেক কবিতা পড়েছে—পড়ে তার মনে হয়েছে তোমার কথা ঠিক। বাংলা সাহিত্যে মনে হয় উত্তর আধুনিক কবিতা আছে।"

"তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ। আরো বলেছে মাথা থেকে হৃদয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার মাথা যেরকমই হোক তোমার হৃদয়টা নাকি ফাটাফাটি।"

ছোটাচ্চু এবারে বিছানায় সোজা হয়ে বসে বলল, "তাই বলেছে? ফাটাফাটি শব্দটা ব্যবহার করেছে?"

"ফাটাফাটি শব্দ বলেছে কি না এখন আর মনে নাই। তবে বুঝিয়েছে ফাটাফাটি। তা ছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

"ফারিহাপুর আজকাল কিছুই ভালো লাগে না। চাকরি ছেড়ে দেবে বলেছে।"

AMARBOI.COM

"চাকরি ছেড়ে দেবে? কেন?"

"তোমার সাথে ব্রেক-আপ হয়েছে বলে মনে হয়।"

ছোটাচ্চু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর বিশাল লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। টুনি বলল, "ছোটাচ্চু তোমাকে একটা কথা বলি?"

"বল।"

"যদি সত্যি সত্যি ফারিহাপু চলে আসে তুমি কিন্তু ঝগড়া শুরু করে দিও না।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় যে আমি শুধু ঝগড়া করে বেড়াই?"

"না তা অবশ্যি মনে হয় না, কিন্তু একবার যখন করে ফেলেছ আবার যেন শুরু না করো সেইটা বলছিলাম।"

"ঠিক আছে।"

"আরেক একটা কথা।"

"কী কথা?"

আমি যে তোমার সাথে ফারিহাপুর কথাগুলো বলেছি ফারিহাপু যেন সেটা না জানে। আমাদের সাথে খোলামেলা কথা বলেছে—আমরা বলেছি তোমাকে কিছু বলব না।"

"ঠিক আছে।"

ছোটাচ্চু গম্ভীর হয়ে তার মোটা বইটা কোলে টেনে নিয়ে আবার পড়ার ভান করতে লাগল, টুনি তখন সাবধানে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার গোলটেবিল বৈঠক, আজকে অবশ্যি টুনিই কথা শুরু করল। বলল, "অনেক সাবধানে একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে। সেই ফাঁদে ছোটাচ্চু আর ফারিহাপু দুইজনেই পা দিয়েছে—এখন খুব সাবধান!"

টুম্পা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে ফাঁদ পেতেছ টুনি আপু?"

"ছোটাচ্চুকে বলেছি ফারিহাপু ছোটাচ্চুর জন্যে পাগল। ফারিহাপুকে বলেছি ছোটাচ্চু ফারিহাপুর জন্যে পাগল। শুধু তাই না,

ফারিহাপুকে বলেছি ছোটাচ্চু খুবই অসুস্থ, ব্লাড ক্যান্সার সন্দেহ করছে।"

"ব্লাড ক্যান্সার?" সবাই আঁতকে উঠল।

"হ্যাঁ। ছোটখাটো অসুখের কথা বললাম না।"

"এসে যখন দেখবে—"

টুনি থামিয়ে দিয়ে বলল, "এসে কী দেখবে কী হবে সেটা পরে দেখা যাবে। এখন টুম্পা আর রিংকুর পুতুলের বিয়েটা যেন ঠিকমতো হয়।"

শান্ত বলল, "পুতুলের বিয়ে না বলে জন্মদিনের কথা বললে হতো।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কার জন্মদিন?"

"আমার!"

প্রমি বলল, "তোমার জন্মদিনের এখনো ছয় মাস বাকি।"

শান্ত বলল, "তাতে কী আছে? একটুখানি মিথ্যা কথা বললে আমি কিছু গিফট পেতাম। সবাই মিলে তোরা যে পরিমাণ মিথ্যা কথা বলছিস তার তুলনায় এইটা কোনো মিথ্যাই না—"

টুনি বলল, "শান্ত ভাইয়া, আমরা শুধু মিথ্যা কথা বলার জন্য এইগুলো করছি না। আমরা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি—"

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক।"

"কাজেই খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। পুতুলের বিয়েটা ঠিকভাবে করতে হবে, যেন ছোটাচ্চু আর ফারিহাপু ধরতে না পারে, এটা মিছিমিছি।"

প্রমি বলল, "ধরতে পারবে না, আমি দেখব সব কিছু যেন ঠিক করে হয়।"

টুনি বলল, "যখন ফারিহাপু আর ছোটাচ্চু এক জায়গায় আসবে তখন খুব কায়দা করে আমাদের সবার সরে যেতে হবে, যেন তারা দুইজন একলা একলা থাকে, নিজেরা নিরিবিলি কথা বলতে পারে—"

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

একজন জানতে চাইল, "যদি ফারিহাপু না আসে?"

AMARBOI.COM

টুনি বলল, "আসবে। ব্লাড ক্যান্সারের কথা কি এমনি এমনি বলেছি!"

টুনির ধারণা সঠিক, পরদিন বিকালবেলা ফারিহাপু এসে হাজির হলো। নীল রঙের একটা শাড়ি পরে এসেছে, কপালে টিপ, চুলে বেলী ফুলের মালা। তাকে যা সুন্দর দেখাচ্ছে সেটা আর বলার মতো না। বাচ্চারা তাকে ঘিরে লাফাতে লাগল, একজন বলল, "ফারিহাপু, তোমাকে যা সুন্দর লাগছে!"

ফারিহাপু একটু লজ্জা পেল, বলল, "বিয়েতে এসেছি তো তাই একটু সেজে এসেছি।"

"খুব ভালো করেছ, দেখছ না আমরাও সেজেছি!" কথাটা সত্যি, বাচ্চারাও সেজে এসেছে, আর কিছু থাকুক কী না থাকুক, সব মেয়েদের মুখে কটকটে লাল লিপস্টিক।

ফারিহার হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট, সেটা বাচ্চাদের হাতে দিয়ে বলল, "পুতুলের জন্যে কী গিফট আনব বুঝতে পারছিলাম না, তাই এই মিষ্টির প্যাকেটটা এনেছি, পুতুল খেতে পারবে তো?"

টুম্পা বলল, "আমাদের পুতুল সব খেতে পারে!"

ফারিহাপুর সাথে যখন কথাবার্তা হচ্ছে তখন টুনি সটকে পড়ে ছোটাচ্চুর ঘরে হাজির হলো। ছোটাচ্চু তার ঘরে নার্ভাসভাবে বসে আছে। টুনি গিয়ে অবাক হয়ে বলল, "কী হলো ছোটাচ্চু? তুমি বিয়েতে যাবে না?"

"যাব।"

"তাহলে রেডি হয়ে নাও। এই ময়লা টি-শার্ট পরে যেতে পারবে না। একটা পাঞ্জাবি না হলে ফতুয়া পরতে হবে।"

"পরছি।" ছোটাচ্চু একটু ইতস্তত করে বলল, "ইয়ে, মানে ফা-ফারিহা কি এসেছে?"

টুনি ছোটাচ্চুর কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আর তুমি শেভ করো নাই কেন? তোমাকে দেখতে সন্ত্রাসীর মতো লাগছে।"

ছোটাচ্চু গালে হাত বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ করছি।" তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, "ফারিহা কি এসেছে?"

"হ্যাঁ। এসেছে। তাড়াতাড়ি চলো, মনে আছে, তুমি হচ্ছ উকিল বাবা!"

ছোটাচ্চু এবারে খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে গেল, টুনি তখন তার হাত ধরে টেনে বিয়ের আসরে নিয়ে যায়। একটা ছোট টেবিলে বিয়ের মঞ্চ তৈরি হয়েছে, সেখানে রিংকুর মেয়ে বিনু বিয়ের সাজ পরে বসে আছে। পুতুল হওয়ার কারণে নিজে থেকে নড়তে পারে না, কেউ একজন তাকে ধরে নাড়াচাড়া করাচ্ছে। বরযাত্রী এখনো আসেনি, বরযাত্রী চলে এলেই আসল অনুষ্ঠান শুরু হবে।

ঘরের মাঝামাঝি কয়েকটা চেয়ার বসানো হয়েছে, তার একটাতে ফারিহা বসে আছে। টুনি ছোটাচ্চুর হাত ধরে তাকে টেনে এনে ফারিহাপুর কাছে আরেকটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়। ঘরের বাচ্চা-কাচ্চারা সবাই চোখের কোনা দিয়ে ছোটাচ্চু আর ফারিহাকে লক্ষ করছে কিন্তু আগে থেকে বলে দেয়া আছে কেউ যেন তাদের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে থাকে, তাই সবাই বিয়ের হৈ-হুল্লোড়ে ব্যস্ত আছে, এরকম ভান করতে লাগল।

ফারিহাপুর কাছে চেয়ারে বসে ছোটাচ্চু গম্ভীর মুখে ফারিহাকে বলল, "কেমন আছ?"

ফারিহাপু বলল, "ভালো।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

তারপর দুইজন আর বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না। দুইজনই মুখ শক্ত করে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল, তাদের দেখে মনে হতে থাকে তারা একজন আরেকজনকে চেনে না।

টুনি চোখের কোনা দিয়ে দুইজনকে লক্ষ করে তারপর দরজার দিকে তাকায়। সেখানে গুড্ডু দাঁড়িয়ে আছে। টুনি তাকে একটা সিগন্যাল দিল, তখন গুড্ডু ছুটতে ছুটতে ভিতরে ঢুকে চিৎকার করে বলল, "বরযাত্রী এসে গেছে। বরযাত্রী এসে গেছে।"

তাকে কী বলতে হবে আগে থেকে শেখানো ছিল কিন্তু উত্তেজনার কারণে পুরোটা বলতে পারল না, 'গেট ধরতে হবে' কথাটা বলতে ভুলে গেল। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা হলো না, সবাই হইহই করে উঠল, একজন বলল, "চল গেট ধরতে হবে।" মুহূর্তের মাঝে ঘরের সব

AMARBOI.COM

বাচ্চারা হাওয়া হয়ে গেল। পুরো ঘরের মাঝখানে দুটো চেয়ারে ফারিহাপু আর ছোটাচ্চু বসে আছে। ঘরে কেউ নাই, শুধু টেবিলে বিয়ের সাজে বসে থাকা বিনু চোখের পাতি না ফেলে তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুইজনের মাঝে ভয়ঙ্কর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা, কী করবে কেউ বুঝতে পারছে না। তখন ফারিহাপু বলল, "তোমার শরীর এখন কেমন আছে?"

ছোটাচ্চু বলল, "ভালো।"

ফারিহাপু বলল, "ও, আচ্ছা।"

আবার দুইজন চুপ করে বসে রইল, কিছুক্ষণ পর ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "তোমার শরীর কেমন আছে?"

ফারিহাপু বলল, "ভালো।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও, আচ্ছা।"

আবার কিছুক্ষণ কেটে গেল, তখন ফারিহাপু জিজ্ঞেস করল, "শুনেছিলাম তোমার শরীরটা নাকি ভালো নাই?"

ছোটাচ্চু চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞেস করল, "কার কাছে শুনেছ?"

ফারিহাপু একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, "টুনি আর প্রমি আমাকে বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়েছিল, তারা বলছিল।"

"তারা কী বলছিল?"

"তোমার শরীরটা নাকি ভালো নাই।"

"আমার শরীর ভালো আছে।"

ফারিহাপু বলল, "ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে?"

ছোটাচ্চু একটু গলা উঁচিয়ে বলল, "কেন খামোখা ডাক্তারের কাছে যাব?"

ফারিহাপু একটু আহত দৃষ্টিতে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, তারপর কোনো কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ তার নখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার কাজ কেমন চলছে?"

"ভালো।"

ছোটাচ্চু বলল, "ভালো?"

ফারিহাপু বলল, "মোটামুটি।" তারপর জিজ্ঞেস করল "তোমার কাজ কেমন চলছে?"

ছোটাচ্চু বলল, "মোটামুটি।"

ফারিহাপু বলল, "তোমার নতুন স্টাফ কেমন?"

"ভালো।"

ফারিহাপু বলল, "ও।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার মনে হয় একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।"

ছোটাচ্চু এবারে কেমন যেন রেগে গেল, বলল, "কেন তুমি একটু পরপর ডাক্তারের কথা বলছ?"

"কারণ শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়।"

"আমার শরীর খারাপ হয় নাই।"

"এই সব অসুখ তাড়াতাড়ি ধরতে পারলে ভালো করে ফেলা যায়।"

ছোটাচ্চু এবারে অবাক হয়ে বলল, "কোন সব অসুখে?"

"তোমায় যেটা সন্দেহ করছে।"

"আমায় কোনটা সন্দেহ করছে?"

ফারিহাপুর হঠাৎ করে মনে পড়ল, টুনি তাকে বলে দিয়েছিল সে যেন ছোটাচ্চুকে তার অসুখের কথা জিজ্ঞেস না করে—কিন্তু এখন মনে হয় একটু দেরি হয়ে গেছে!

ছোটাচ্চু আবার জিজ্ঞেস করল, "আমার কোনটা সন্দেহ করছে?"

ফারিহাপু বলল, "থাক। ছেড়ে দাও।"

"না। কেন ছেড়ে দেব? তোমাকে বলতে হবে।"

ফারিহাপু একটু অবাক হয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল, "বলল, তুমি আমার সাথে এরকম করে কথা বলছ কেন?"

"কী রকম করে কথা বলছি?"

"রেগে রেগে। যেন আমি তোমাকে দেখতে এসে দোষ করে ফেলেছি।"

"তুমি আমাকে মোটেই দেখতে আসো নাই। তুমি পোলাপানের পুতুলের বিয়েতে এসেছ।"

ফারিহাপু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তুমি আমার সাথে যেরকম ব্যবহার করেছ আমার কোনোদিন তোমার সাথে কথা বলাই ঠিক না। শুনলাম খুব শরীর খারাপ তাই ভাবলাম—"

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চুর হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হলো, ফারিহাপুর দিকে ঘুরে বলল, "একটু পরে পরে বলছ আমার খুব শরীর খারাপ। টুনি-প্রমি কি শরীর খারাপ বলেছে?"

কাজটা ঠিক হবে কি না ফারিহাপু ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু তারপরেও মাথা নাড়ল, "বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"বলেছে—" ফারিহাপু আবার থেমে গেল।

"কী বলেছে?"

"বলেছে তোমার ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে।"

"ব্লা-ড-ক্যা-ন্সা-র!!" বলে ছোটাচ্চু একটা গগনবিদারি চিৎকার দিল। ঘরের বাইরে জানালার নিচে উবু হয়ে বসে টুনি ছোটাচ্চু আর ফারিহাপুর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল, ছোটাচ্চুর এই গগনবিদারি চিৎকার শুনে সে বুঝে গেল তাদের এই বিশাল পরিকল্পনা (কিংবা ষড়যন্ত্র) ফাঁস হয়ে গেছে।

ফারিহাপু একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? তোমার ব্লাড ক্যান্সার হয় নাই?"

"ব্লাড ক্যান্সার কেন—আমার ব্লাড ডিসেন্ট্রিও হয় নাই।"

"তাহলে যে বলল—"

"আর কী কী বলেছে ঐ মিচকি শয়তান ঐ পিছলা পাঙাস মাছ?"

"বলেছে তুমি ঘুমের মাঝে আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করো—"

ছোটাচ্চু গরম হয়ে বলল, "আর কী বলেছে?"

"বলেছে যে তুমি বলেছ বাংলা সাহিত্যে পোস্ট মডার্ন পোয়েট্রি নাই—"

ছোটাচ্চু হুংকার দিয়ে বলল, "আমি বলি নাই।"

"তুমি ঘুমের মাঝে বলেছ।"

"আমি ঘুমের মাঝে বলি নাই।"

ছোটাচ্চু আর ফারিহাপু একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ছোটাচ্চু একটা চাপা গর্জনের মতো শব্দ করল, বলল, "আর তুমি কি শুনতে চাও ঐ ফাজিল ডাবল ক্রস বাইম মাছ আমার কাছে কী বলেছে?"

AMARBOI.COM

ফারিহাপু একটু ভড়কে গিয়ে বলল, "কী বলেছে?"

"বলেছে তুমি দিন-রাত কবিতা পড়ে এখন জানতে পেরেছ যে বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিক কবিতা আছে।"

ফারিহাপু বলল, "আমি বলি নাই।"

আরো বলেছে, "আমার সাথে ব্রেক-আপ হওয়ার কারণে তোমার এত মন খারাপ যে তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ—"

"আমি চাকরিটা ছেড়ে দিব কিন্তু অন্য কারণে।"

ছোটাচ্চু বলেছে, "আর বলেছে—"

"কী বলেছে?"

"বলেছে তুমি বলেছ আমার হৃদয়টা ফাটাফাটি—"

"ফাটাফাটি?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "ঐ পাজির পা ঝাড়া মিচকি শয়তান পিছলা পাঙাসগুলো কী করেছে দেখেছ? তুমি দেখেছ?"

ফারিহাপু মাথা নাড়ল। ছোটাচ্চু হিংস্র বাঘের মতো গর্জন করে বলল, "আজকে আমি খুন করে ফেলব। সবগুলোর মাথা টেনে ছিঁড়ে ফেলব, ধড় থেকে আলাদা করে ফেলব—" তারপর হুংকার দিয়ে ডাকল, "টুনি—প্রমি—শান্ত—কোথায় তোরা?"

প্রথমে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ছোটাচ্চু দ্বিতীয়বার হুংকার দেওয়ার পর আস্তে আস্তে সবাই মাথা নিচু করে ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরে ঢুকে মেঝের দিকে তাকিয়ে সবাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটাচ্চুর নাক দিয়ে গরম বাতাস এবং চোখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছিল, সে বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের এত বড় সাহস? আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলিস? আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলিস? এই বয়সে এই রকম মিথ্যা কথা বলা শিখেছিস, বড় হয়ে তোদের কী হবে? হার্ডকোর ক্রিমিনাল হবি?"

কেউ কোনো কথা বলল না, বড়রা যখন রেগে যায় তখন তাদের রাগটা বের হতে দেওয়ার জন্যে সুযোগ দিতে হয়। তখন কথাবার্তা বলা ঠিক না।

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু আবার বলল, "কোথা থেকে এই দুই নম্বরি কাজকর্ম শিখেছিস? আমি কিছু বলি নাই দেখে বেশি লাই পেয়ে গেছিস? খুন করে ফেলব সবগুলোকে। মাথা টেনে ছিঁড়ে ফেলব—আমার সাথে রংবাজি? আমার সাথে গিরিংবাজি? আমার সাথে মামদোবাজি?"

ছোটাচ্চু টানা চিৎকার করতে থাকল, শেষ পর্যন্ত যখন দম নেবার জন্যে একটু থেমেছে তখন টুনি দুর্বলভাবে বলল, "ছোটাচ্চু তুমি এত রাগ হচ্ছ কেন? তোমার কপাল ভালো যে আমরা অরিজিনাল প্ল্যানে যাই নাই। দুই নম্বর প্ল্যানটা নিয়েছি।"

ছোটাচ্চু একেবারে হকচকিয়ে গেল, বলল, "অরিজিনাল প্ল্যান? সেটা আবার কী?"

"অরিজিনাল প্ল্যানটা আরো ডেঞ্জারাস ছিল। ঝুমু খালার প্ল্যানগুলো সবসময় ডেঞ্জারাস হয়।"

"ঝুমু খালা? এর মাঝে ঝুমু খালা কোত্থেকে এসেছে?"

টুনি বলল, "এইসব ব্যাপারে ঝুমু খালা খুব ভালো প্ল্যান দিতে পারে।"

ছোটাচ্চু গরম হয়ে বলল, "একটু পরিষ্কার করে বলবি, কোন সব ব্যাপার?"

টুনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না বোঝার কী আছে? তুমি না এত বড় ডিটেকটিভ, তুমি বুঝতে পারছ না কোন সব ব্যাপার?"

ছোটাচ্চু এবারে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, ব্যাপারটা কী বুঝে গেল, তখন তাদের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল। যার অর্থ এখন প্রতি-আক্রমণ করার সময় হয়েছে, টুনি প্রথমে প্রতি-আক্রমণ শুরু করল, বলল, "তোমরা বড় মানুষেরা ঝগড়া করবে আর আমাদের সেটা সামলাতে হবে?"

আরেকজন বলল, "তোমরা জানো আমরা তোমাদের জন্যে কত কষ্ট করেছি?"

আরেকজন বলল, "এত বড় হয়েছ, এখনো ছোট বাচ্চাদের মতো ঝগড়া করো, তোমাদের লজ্জা করে না?"

ছোট একজন বলল, "ছোট বাচ্চারা মোটেই ঝগড়া করে না। বড় মানুষেরা ঝগড়া করে।"

AMARBOI.COM

আরেকজন বলল, "ঝগড়া করেছ তো করেছ, এখন মিটমাট করে ফেলবে না?"

আরেকজন বলল, "একজন ছেলে দেবদাস আরেকজন মেয়ে দেবদাস।"

"ঝগড়া করার কোনো কারণ আছে? উত্তর না কি দক্ষিণমুখী কবিতা নিয়ে ঝগড়া।"

"কবিতা উত্তরমুখী হলে হবে, দক্ষিণমুখী হলে হবে—তোমরা সেটা নিয়ে কেন ঝগড়া করবে?"

শান্ত বলল, "দুনিয়া থেকে কবিতা জিনিসটাই উঠিয়ে দেওয়া দরকার। দুনিয়ার সব ঝামেলা করে কবিতা। সব কবিদের ধরে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া দরকার।"

কবিতা কখন ঝামেলা করল এবং কবিদের ফাঁসি দিয়ে সেই সমস্যা কীভাবে মেটানো যাবে সেটা কেউ বুঝতে পারল না, এবং সেটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাল না। প্রতি-আক্রমণের সময় এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, সবাই মিলে হইচই চিৎকার করতে থাকে।

হঠাৎ করে রিনরিনে গলায় গুড্ডু বলল, "এখনই একজন আরেকজনকে ধরে চুমু খাও।"

ছোটাচ্চু চোখ বড় বড় করে গুড্ডুর দিকে তাকাল, বলল, "এই পাজি ছেলে, তুই চুমু খাওয়ার কী বুঝিস?"

"আমি সিনেমায় দেখেছি।"

"কী সিনেমা দেখিস আজকাল?"

"বড়দের সিনেমা।"

"তুই বড়দের সিনেমা দেখিস? সাহস তো কম না—"

"ছোটদের সিনেমা নাই, আমি কী করব?"

টুনিও তখন সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো, বলল, "গুড্ডু যখন আম্মুর সাথে ঝগড়া করে তখনো তো আম্মু গুড্ডুকে আদর করে চুমু খায়। সেজন্যে বলেছে।"

বাচ্চারা হঠাৎ করে লক্ষ করল ফারিহাপু মুখে আঁচল দিয়ে হাসি থামানোর চেষ্টা করছে। শুধু তা-ই না, ছোটাচ্চু খুব রেগে আছে

সেরকম ভঙ্গি করলেও মুখের মাঝে একটা চাপা হাসি উঁকি দিতে শুরু করেছে। সবাই বুঝতে পারল খুব দ্রুত বিপদ কেটে যাচ্ছে।

ফারিহাপু এতক্ষণ কথা বলে নাই, এই প্রথম কথা বলল, "তোমাদের অরিজিনাল প্ল্যানটা এখনো শোনা হয়নি।"

শান্ত বলল, "এটা না শোনাই ভালো।"

"শুনি তবুও।"

টুনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা যখন ঝগড়া করেছ তখন তোমাদের যেরকম মন খারাপ হয়েছিল আমাদের তার থেকে বেশি মন খারাপ হয়েছে। তোমাদের ঝগড়া কীভাবে মিটানো যায় সেটা নিয়ে আমাদের একটা মিটিংয়ে ঝুমু খালা ছিল। ঝুমু খালা বলেছে তাদের গ্রামে একশ' কুড়ি না হলে একশ' চল্লিশ বছর বয়সের জরিনি বেওয়া থাকে, তার পান পড়া দুইজনকে দুইটা দিলে সাথে সাথে মিলমিশ হয়ে যাবে।"

প্রমি বলল, "কিন্তু আমরা সেই পান পড়া কোথায় পাব?"

টুনি বলল, "আমি অবশ্যি তাবিজ, কবজ, পান পড়া বিশ্বাস করি না। মনে নাই—"

টুনি কী মনে করানোর চেষ্টা করছে ছোটাচ্চু খুব ভালো করে বুঝতে পারল, তাই তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে, মনে আছে—"

"তাই আমরা অন্য কী করা যায় চিন্তা করছিলাম।"

প্রমি বলল, "ঝুমু খালা বলল, মেয়েদের মন খুব নরম হয় তাই যদি ছোটাচ্চুর কঠিন কোনো অসুখ হয় তাহলে ফারিহাপু সবকিছু ভুলে ছুটে এসে মিলমিশ করে ফেলবে।"

শান্ত বলল, "কঠিন অসুখ হচ্ছে কলেরা না হয় যক্ষ্মা। সেই রোগের জীবাণু কই পাব?"

টুম্পা বলল, "তখন ঝুমু খালা বলল, বড় অসুখ যদি না করানো যায় তাহলে ঠ্যাঙ ভেঙে দিলেও হবে।"

ছোটাচ্চু এবারে একটা চিৎকার করে উঠল, "ঠ্যাং ভেঙে দিবে?"

AMARBOI.COM

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। সেইটা ছিল অরিজিনাল প্ল্যান। সিঁড়ির মাঝে কলার ছিলকে রেখে তোমাকে একটা ধাক্কা দিবে, কলার ছিলকের উপর পা পড়ে সিঁড়ি দিয়ে তুমি গড়িয়ে পড়বে।"

টুম্পা মনে করিয়ে দিল, "শান্ত ভাইয়া সেইটা করবে!"

টুনি বলল, "তোমার খুশি হওয়া উচিত ছিল যে, আমরা অরিজিনাল প্ল্যানটা কাজে লাগাই নাই। তার বদলে এই প্ল্যানটা কাজে লাগিয়েছি।"

ফারিহাপু বলল, "শোনো, তোমাদের একটা কথা বলি। ভবিষ্যতে যদি কখনো অন্য কাউকে এরকম কিছু করতে হয়, খবরদার ব্লাড ক্যান্সারের কথা বলবে না।" ফারিহাপুর মুখটা হঠাৎ কেমন যেন দুঃখী দুঃখী দেখাতে থাকে, মনে হয় বুঝি কেঁদে ফেলবে। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল, তারপর প্রায় ভাঙা গলায় বলল, "তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না গত চব্বিশ ঘণ্টা আমার কী গিয়েছে—" ফরিহাপু আবার ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে থাকে।

AMARBOI.COM

প্রথমে টুনি ছুটে গিয়ে ফারিহাপুর সামনে গিয়ে বসে তার হাত দুটো ধরে ফেলল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "আমার খুব খারাপ লাগছে ফারিহাপু, আমরা তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি—প্লিজ ফারিহাপু তুমি মন খারাপ কোরো না, তুমি আমাদের উপর রাগ হয়ো না—আমরা বুঝতে পারছিলাম না কী করব—"

টুনির দেখাদেখি অন্য সবাই তখন ফারিহাপুর কাছে গিয়ে তাকে ঘিরে বসে ধরে বলল, "প্লিজ ফারিহাপু প্লিজ—"

আর তখন ফারিহাপু বাচ্চাদের মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল, আর তাকে কাঁদতে দেখে অন্যরাও কাঁদতে শুরু করল।

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ এই দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর কেশে গলা একটু পরিষ্কার করে বলল, "ইয়ে মানে, ব্লাড ক্যান্সারের কথাটা বলেছে আমাকে নিয়ে—কান্দাকাটি যদি করতে হয় তাহলে আমাকে ধরে কান্দাকাটি করবি, ফারিহাপুকে ধরে কাঁদছিস কেন?"

প্রমি বলল, "তুমি যদি এটা বুঝতে তাহলে এই অবস্থা হতো না। সব দোষ তোমার।"

"আমার?"

"হ্যাঁ।" টুম্পা বলল, "নিশ্চয়ই তোমার বুকে লোম নাই। নিষ্ঠুর মানুষের বুকে লোম থাকে না।"

"তোর বুকে লোম আছে ফাজিল কোথাকার?"

"আমি ছোট। তা ছাড়া আমি মেয়ে। বুঝেছ?"

যখন সবাই কান্নাকাটি থামিয়ে চোখ-নাক-মুখ মুছে একটু শান্ত হলো তখন ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক আছে অনেক হয়েছে—এখন তাহলে পুতুলের বিয়ে শুরু হোক।"

তখন সব বাচ্চারা একে অন্যের দিকে তাকাল, কেউ কোনো কথা বলল না। ছোটাচ্চু বলল, "কী হলো? পুতুলের বিয়েটাও কি মিছিমিছি? ষড়যন্ত্রের অংশ?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "এটা একটুখানি ষড়যন্ত্রের অংশ হলেও পুতুলের বিয়েটা মিছিমিছি ছিল না। এটা সত্যিকারের বিয়ে ছিল। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

আবার সবাই থেমে গেল, একে অন্যকে গুঁতো দিয়ে বলতে লাগল, "তুই বল—তুই বল—"

ছোটাচ্চু বলল, "কী হলো? বলবি কী হয়েছে?"

শেষ পর্যন্ত টুনি গলা পরিষ্কার করে আবার বলতে শুরু করল, "আসলে হয়েছে কী—যখন রিংকুর ছেলে বরযাত্রী হয়ে এসেছে তখন সবাই মিলে আমরা গেট ধরেছি। তখন বরযাত্রীর পক্ষ থেকে শান্ত বলেছে, যৌতুক না দিলে সে বিয়ে দেবে না।"

ছোটাচ্চু বলল, "ছেলের মা হচ্ছে রিংকু তাহলে শান্ত কেন যৌতুক চায়? এটা তো রীতিমতো সন্ত্রাসী কাজকর্ম।"

টুনি বলল, "তুমি ঠিক বলেছ ছোটাচ্চু। শান্ত ভাইয়া আসলে সন্ত্রাসী লাইনেই যাচ্ছে। আমরা তাকে বলেছি যৌতুক হচ্ছে বেআইনি। যৌতুক চাইলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে—কিন্তু শান্ত ভাইয়া

AMARBOI.COM

বলল যৌতুক না দিলে সে বিয়ে হতে দিবে না। তাই শেষ পর্যন্ত আমরা যৌতুক দিতে রাজি হলাম—"

ফারিহাপু বলল, "কী সর্বনাশ! যৌতুক কী দিতে হবে?"

শান্ত অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "বেশি কিছু না ফারিহাপু, মাত্র একশ' টাকা।"

"তাও রক্ষা।"

টুনি বলল, "পুতুলের বিয়ে, সবকিছুই মিছিমিছি তাই আমরা ভেবেছি টাকাটাও মিছিমিছি। তাই কাগজ কেটে আমরা মিছিমিছি একশ' টাকার নোট বানিয়ে শান্ত ভাইয়াকে দিয়েছি, তখন শান্ত ভাইয়া বলল, মিছিমিছি একশ' টাকা দিলে হবে না, সত্যি সত্যি একশ' টাকা দিতে হবে—"

ছোটাচ্চু আর ফারিহাপু চোখ কপালে তুলে বলল, "সত্যি সত্যি একশ' টাকা! কী সর্বনাশ!"

শান্ত বলল, "এত বড় বিয়ে, কোনো খরচপাতি হবে না এটা ঠিক না। সেই জন্যে—"

টুনি বলল, "আমরা রাজি হই নাই। তখন শান্ত ভাইয়া পুতুলটা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল—আমরাও ধরেছি যেন নিতে না পারে। তখন—" টুনি আবার থেমে গেল।

"তখন কী?"

"তখন পুতুলের মাথাটা ছিঁড়ে আলগা হয়ে গেল। মাথাটা শান্ত ভাইয়ের কাছে, শরীরটা আমাদের কাছে!"

"এখন কী হবে?"

"বিয়েটা পিছিয়ে দিতে হবে।" রিংকু মুখ গম্ভীর করে বলল, "শান্ত ভাইয়া মাথাটা ফিরিয়ে দিলে আমার ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করব। মাথাটা সেলাই করে লাগানো হবে।"

ফারিহাপু জানতে চাইল, "হাসপাতালের সার্জন কে?"

"ঝুমু খালা। ঝুমু খালা এক নম্বর সার্জন।"

"সেলাই করে লাগাতে পারবে?"

"পারবে।"

AMARBOI.COM

ছোটাচ্চু গম্ভীর মুখে শান্তর দিকে তাকাল, "শান্ত।"

"বলো ছোটাচ্চু।"

"এক্ষুনি রিংকুর ছেলের মাথা ফিরিয়ে দে। যদি কোনোদিন যৌতুক চাস তাহলে তোর খবর আছে।"

শান্ত পকেট থেকে পুতুলের মাথাটা বের করে রিংকুর হাতে দিয়ে বলল, "আসলে আমি ঠাট্টা করছিলাম! এরা ঠাট্টাও বুঝে না।"

ছোটাচ্চু বলল, "এরপর আর এরকম ঠাট্টাও করা যাবে না। মনে থাকবে?"

"থাকবে।"

ফারিহাপু বলল, "তাহলে এখন কি সব শেষ?"

প্রমি বলল, "না শেষ না। এখন খাওয়া-দাওয়া হবে।"

"মিছিমিছি নাকি সত্যি সত্যি?"

"সত্যি সত্যি। ঝুমু খালা খাবার তৈরি করেছে।"

ছোটাচ্চু দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এই ঝুমু খালা কেমন করে এই বাসায় থাকে আমি দেখব। কী ডেঞ্জারাস মেয়ে—আমার ঠ্যাঙ ভেঙে ফেলার বুদ্ধি দেয়!"

ফারিহাপু হি হি করে হেসে বলল, "উদ্দেশ্যটা মহৎ! মহৎ উদ্দেশে কাজ করলে কোনো সমস্যা নাই।"

ছোটাচ্চু বিড়বিড় করে বলল, "আমি মহৎ উদ্দেশের খেতা পুড়ি।"

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু, এই বাসায় তোমার যেটুকু গুরুত্ব, ঝুমু খালার গুরুত্ব তার থেকে অনেক বেশি। ঝুমু খালা ইচ্ছে করলে তোমাকে বাসা থেকে বের করে দিতে পারবে। তাই খামোখা ঝুমু খালার পিছনে লাগতে যেয়ো না।"

ছোটাচ্চু বলল, "সেইটাই হয়েছে মুশকিল। এই বাসায় আমার কোনো গুরুত্ব নাই!"

সবাই মিলে বিয়ের খাওয়া খেলো, ডাল পুরি, কাবাব আর পায়েস। সাথে ফারিহাপুর আনা মিষ্টি। তারপর ফারিহাপু বাসায় যাবার জন্যে রেডি হলো। অনেক দিন পর ভাব হয়েছে তাই ছোটাচ্চু ফারিহাপুকে এক সেকেন্ডের জন্যে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। ফারিহাপু যখন

বিদায় নিয়ে বাসা থেকে বের হবে তখন ছোটাচ্চু বলল, "আমি তোমাকে পৌঁছে দেই?"

ফারিহাপু বলল, "পৌঁছে দিবে? ঠিক আছে, পৌঁছে দাও!"

ছোটাচ্চু তখন তার ঘরে গেল মানি ব্যাগ, টেলিফোন আনতে। টুনি তখন ফারিহাপুর হাত ধরে বলল, "ফারিহাপু।"

"বলো।"

"তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

"না রাগ করিনি।"

"তোমাকে একটা কথা বলি?"

"বলো।"

"ছোটাচ্চু মানুষটার বুদ্ধি খুব বেশি নাই, কিন্তু মানুষটা খুব ভালো।"

"জানি।"

"তুমি না থাকলে ছোটাচ্চুর কিন্তু কোনো বুদ্ধির সাপ্লাই থাকবে না।"

"সেটা হয়তো সত্যি নাও হতে পারে।"

"না ফারিহাপু এটা সত্যি। তাই—"

"তাই কী?"

টুনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ছোটাচ্চু তোমার সাথে যত ঝগড়াই করুক তুমি কখনো ছোটাচ্চুকে ছেড়ে যেও না। প্লিজ!"

ফারিহাপু মুখ টিপে বলল, "আর কিছু?"

"হ্যাঁ। আমরা কিন্তু তোমাকে সব সময়ই ফারিহাপুই ডাকব।"

ফারিহাপু একটু অবাক হয়ে বলল, "তাই তো ডাকবে!"

"মানে বলছিলাম কী—" টুনি বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "তোমাকে কিন্তু ছোটাচ্চি ডাকব না!"

ফারিহাপু টুনির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, তারপর হি হি করে হাসতে থাকল।

AMARBOI.COM